হইল। সরলা তাড়াতাড়ি বিমাতার কাছে গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, সে সদাগর্ব্বিত মুখখানি মসীসিক্ত বস্ত্রের ন্যায় মলিন হইয়াছে, চক্ষু দুটী মুদ্রিত ও কোটরগত; সর্ব্বশরীর স্থির ও নিস্পন্দ। সরলা কাঁদিয়া বলিল, "বাবা! এ কি হইল, মা যে মরিয়া গেল।"

হরেশ এতক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল। মৃত্যুর কথা শুনিয়া তাহার যেন জ্ঞান হইল। সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "এ মাও সে মার কাছে গেল! আমার মার কাছে যাওয়া হল না!!"

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

ভারতহিতৈষিণী কুমারী ই, এ, ম্যানিং।

কুমারী ম্যানিং সুবিখ্যাত কুমারী কার্পেণ্টারের শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বপ্রকার হিতব্রতে ইঁহার সহানুভূতি ও সহায়তা দেখা যায়। ইনি বহু দিনাবধি ভারত জাতীয় সভার সম্পাদিকা এবং তাহার পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন। ইংলণ্ড-প্রবাসী যুবকদিগের মাতৃস্বরূপিণী হইয়া ইনি তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সদুপদেশ দ্বারা সহায়তা এবং সময় সময় অর্থানুকূল্য দ্বারাও অভাব দূর করিয়া থাকেন। ইনি কলিকাতায় এই দ্বিতীয় বার আসিয়াছেন। এবং এখানকার নারীজাতি সম্বন্ধীয় শুভানুষ্ঠান সকল পরিদর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছেন। গত ৯ই জানুয়ারি সোমবার বরাহনগর বিধবাশ্রম দর্শন করিতে গেলে তত্রত্য অধিবাসিনীগণ তাঁহাকে যে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। কুমারী ম্যানিং এই আশ্রমের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ও সকল বন্দোবস্ত বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়া যারপরনাই প্রীত হইয়াছেন। তিনি জানুয়ারির শেষে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে গিয়াছেন, তথা হইতে বোম্বাই দিয়া বিলাত যাত্রা করিবেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে নিরাপদে স্বদেশে উত্তীর্ণ করুন, এবং তাঁহা দ্বারা ভারতের নরনারীদিগের আরও কল্যাণ ও উন্নতি বৰ্দ্ধিত করুন্।

অভিনন্দন-পত্র।

রমণীকুল-বরণীয়া মাননীয়া
কুমারী শ্রীমতী ম্যানিং মহোদয়া
উদারহৃদয়াসু—

প্রিয় ভগিনি!

আমরা এই দূরদেশ হইতে আপনার গুণাবলী শুনিয়া মোহিত হইয়াছি! যে দিন শুনিয়াছি, আপনি স্ত্রীজাতির হিতাকাঙ্ক্ষিণী; যাহারা শিক্ষার অভাবে—জ্ঞানের অভাবে ইতর শ্রেণীর জীবের ন্যায় দুঃখে জীবন যাপন করে, আপনি

তাহাদিগের দুঃখে দুঃখিতা এবং তাহাদিগের ক্লেশমোচনের জন্য সতত চেষ্টাবতী, সেই দিন হইতেই আপনাকে শ্রদ্ধা করি। যে দিন শুনিয়াছি, আপনি স্বার্থ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, ভোগ-বিলাসে বিমুখ হইয়া পরের হিতব্রত ধারণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই আপনাকে হৃদয়ের উচ্চ আসন দান করিয়াছি। যে দিন শুনিয়াছি, দুঃখিনী হিন্দু-বিধবাদিগের ক্রন্দনধ্বনি, কত নদ নদী, কত দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া মহাসাগরের পারে সুদূর ইংলণ্ডে আপনার কর্ণে প্রবেশ করে, এবং সেই স্থান হইতে আপনি তাহাদের দুরবস্থামোচনে সাহায্যকারিণী, সেই দিন হইতেই আমাদের চিত্ত আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ।

আমরা সেই দুঃখিনী হিন্দুবিধবা! আপনাকে আজ নিকটে পাইয়া আমাদের অন্তঃকরণের আনন্দোচ্ছ্বাস জানাইতেছি, আমাদের দুঃখের কথা আজ আর আপনাকে কি বলিব! আমরা কাঙ্গালিনী, ধন রত্ন আমাদের কিছুই নাই, আপনার উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিবার উপযুক্ত আয়োজন আমাদের নাই, আমাদের বিদ্যা নাই, শিক্ষা নাই, অর্থ নাই। আমাদের ন্যায় শত শত অনাথা স্ত্রীলোক এ দেশে ঐরূপ অবস্থায় পতিত রহিয়াছে; শত শত বিধবা, ভদ্রবংশে জন্মিয়া সুশিক্ষার অভাবে সাহায্যের অভাবে, ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, কে তাহাদের মুখের দিকে চায়? কে তাহাদের হইয়া দুটা কথা বলে?

আমাদের সৌভাগ্য যে, আপনার করুণ-দৃষ্টি এই পতিত দেশে পতিত হইয়াছে, আজ আপনার আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুররুদ্ধা বিধবাদিগের হৃদয়ে গভীর ভাব আপনার প্রতি উত্থিত হইতেছে। তাহাদিগের রুদ্ধ কণ্ঠ তাহা প্রকাশ করিতে না পারিলেও অন্তর্যামী ভগবান্ তাহা জানিতেছেন।

আপনি যে ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাদিগের হিত উদ্দেশ্যে এ দেশে আসিয়াছেন, আমরা সে জন্য আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আপনি সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবিনী হইয়া এইরূপ পরোপকারব্রতে চিরদিন স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করুন, আমরা সর্ব্বসাক্ষী দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

বরাহনগর,
৯ জানুয়ারী, ১৮৯৯

বরাহনগর—
হিন্দু-বিধবাশ্রমবাসিনী
বিধবাগণ।

সাধুসঙ্কল্প ও সাধুচেষ্টা।

গোহত্যা নিবারণ।

ঢাকার প্রখ্যাতনামা বাবু লাল মোহন সাহা শঙ্খনিধির সাধু চেষ্টা ও দানশীলতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত। গত ৮ই পৌষ, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বাবু ভজহরি সাহা শঙ্খনিধির আদ্য শ্রাদ্ধ গিয়াছে। লাল মোহন বাবু চিরন্তন প্রথানুসারে মুক্তহস্ততার পরিচয় প্রদান করিয়া বহুল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বিস্তর দান দক্ষিণা ভোজনাদি এবং সহস্র সহস্র দরিদ্রদিগকে আহার ও অর্থ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শঙ্খনিধির উদ্ভাবনী শক্তি ও ঈশ্বরাদিষ্ট সাধু অভিপ্রায় হইতে সেইদিনে আর একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতবর্ষে ঢাকা একটী মুসলমান-প্রধান প্রধান নগর। এই নগরে বিস্তর মুসলমানের বাস, সুতরাং প্রতি দিনই বহু বহু গোহত্যা হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে গোমাংস বিক্রয়ের দোকানও যথেষ্ট। কিন্তু বড় সুখের বিষয় লালমোহন বাবু সেই শ্রাদ্ধসময়ে ঢাকায় গোহত্যা হইতে দেন নাই, সুতরাং সেই এক দিনে তাঁহার যত্নে বহু গোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

এমন কি সেই দিনে ঢাকার সমস্ত গোমাংসের (কসাই) দোকান বন্ধ ছিল। লালমোহন বাবু পরম বৈষ্ণব, সেই বৈষ্ণবোচিত সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানে সফলকাম হইয়াছেন। যে একটী দুইটী গোহত্যার ক্ষণ নিবারণের জন্য ভারতে স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ঘোর, দাঙ্গা ও বিবাদ চলিতেছে,---এমন কি কোন রাজা কি ধনীও যাহাতে কখনও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আজ লালমোহন বাবুর চেষ্টায় শত শত গোর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, লালমোহন বাবুর উদারতায়, সাধুতায় দানশীলতায়, ঢাকায় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ ও তৎপ্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার বাক্য পালন করিয়া থাকেন। আমরা হিন্দু আর্য্যগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া কায়মনোবাক্যে লালমোহন বাবুকে ধন্যবাদ দিতেছি। না হবে কেন সাধু যাহার চেষ্টা, ঈশ্বর তাহার সহায়। এক বৎসর হয় নাই এই লাল মোহন বাবুই কন্যা বিবাহ উপলক্ষে অনেক কয়েদীকে তাহাদের দেনা ও অর্থদণ্ডের টাকা প্রদান করিয়া দেওয়ানি ও ফৌজদারি কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই কিছু পূর্ব্বে, দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাটীতে প্রকাশ্য অন্নছত্র করিয়া বহুদিন সহস্র ২ লোককে আহার প্রদান করেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে কাশী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, ও বঙ্গ বিহার সর্ব্বদেশ হইতে পণ্ডিত-

দিগকে আহ্বান করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যাদি বহুদান দক্ষিণা প্রদান করেন। লাল মোহন বাবুকে ঢাকার সাহেবগণও সম্মাননা ও তাঁহার সদনুষ্ঠানে আদর এবং বিনীত ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার বাটীতে যাইয়া অনুগৃহীত করেন। লাল মোহন বাবুই মুসলমানদের সহানুভূতি পাইয়া শত ২ গোহত্যা নিবারণে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রী—

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

(৪০৭ সংখ্যা—২৯০ পৃষ্ঠার পর)

ছয়—ষট্‌কর্ম্ম (১) ব্রাহ্মণের ছয়টী কর্ত্তব্য—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ; (২) মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ ও শান্তি। ষট্ কারক—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। ষট্‌কুঠা (ছয় প্রকার প্রেতিনী—ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, সাকিনী ও হাকিনী)। ষট্‌চক্র (যোগশাস্ত্র মতে শরীরস্থ ৬ চক্র—মূলাধার, লিঙ্গমূল, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও ভ্রূযুগ)। ষট্‌পদ—ভ্রমর ; ষট্‌পদী—ভ্রমরী। ষট্ প্রাজ্ঞ—ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ, লোকব্যবহার ও তত্ত্বার্থ এই ছয় বিষয়ে যাহার প্রাজ্ঞতা। ষড়ঙ্গ—(১) ২ জঙ্ঘা, ২ বাহু, শির ও মধ্যদেশ, (২) ছয় শাস্ত্র—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। ষড়ষ্টক—(১) মকরমিথুন, কন্যাকুম্ভ, সিংহমীন, বৃষতুলা, অলিমেষ, কর্কট ধনু—মিত্রষড়ষ্টক (২) মকরসিংহ, কন্যামেষ, তুলামীন, কর্কটকুম্ভ, বৃষধনু, বৃশ্চিকমিথুন—অরি ষড়ষ্টক। ষড়্‌গয়া—গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া ও গয়াসুর। ষড়্‌দুর্গ—গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, ধান্যদুর্গ, মহীদুর্গ, মৃৎদুর্গ ও বনদুর্গ। ষড়্‌রস—মধুর, লবণ, তিক্ত, অম্ল, কষায় ও কটু। ষড়্‌রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য। ষড়্‌দুঃখভাগী—নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ বিশিষ্ট লোক। ষড়ানন ও ষড়্‌বক্ত্র—কার্ত্তিক ; ষড়্‌মাতৃকা—অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা। ছয় ঋতু—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত। ষড়্‌ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য। ষড়্‌গুণ—সন্ধি, বিগ্রহ, যান (শত্রুরাজ্যের দিকে অগ্রসরণ), আসন (শত্রুরাজ্যে গাঢ় প্রবেশ), দ্বৈধ (বিভাগ), আশ্রয় (শত্রুরাজ্য হস্তগত করা)। ষড়্‌বিধ সৈন্য—মৌল (কুলক্রমাগত) ভৃত্য, সুহৃদ, শ্রেণী (ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী সাহায্যকারী লোক), শত্রু (শত্রুর বিপক্ষ), আটবিক (জঙ্গলে, পাহাড়ে)।

বড়বীহি—শ্যামর, নীবার জর্ত্তিল, যাবেধুক বেণুযব,মর্কটক। ছয়রাগ—(১) ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ; মতান্তরে—শিব মুখ হইতে জাত পঞ্চরাগ—শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব ও মেঘ এবং দুর্গার মুখজাত নটনারায়ণ।

সাত—সপ্তপাতাল—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিম, মহাতল, সতল, পাতাল। সপ্তসমুদ্র—লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও জলের সমুদ্র। সপ্তজিহ্ব—অগ্নি (ইহার সাত জিহ্বা—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিত, সুধুম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা)। সপ্তবার—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। সপ্ত-বর্ণ—বায়লেট, ধূমল, নীল, হরিত, পীত, পাটল, লোহিত। সপ্তাশ্ব—সূর্য্য। সপ্তসাম—রথন্তর, বৃহৎসাম, বামদেব্য, বৈরূপ, পাবমান, বৈরাজ ও চান্দ্রমস সামবেদের এই ৭ প্রকরণ। সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। সপ্তভুবন—ভূ, ভুব, স্বর্গ, জন, তপ, মহ ও সত্য। সপ্তগণ—যক্ষ, জাগৃ, দরিদ্রা, কাস, শাস, দীধী, বেবী ব্যাকরণের সাত গণ। সপ্তকুলপর্ব্বত—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্, পারিপাত্র ও বিন্ধ্য। সপ্তস্বর বা সুর—সা, রে, গা, মা, পা ধা, নি। সপ্তরাজ্য—স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল। সপ্তধাতু—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। সপ্তপদী—বিবাহে দম্পতীর এক এক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সপ্তপদ অগ্রসরণ; সপ্তপর্ণী—ছাদিম গাছ। সপ্তর্ষি—মরীচি, অত্রি, অঙ্গীরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। সপ্তশলাকা—(তির্য্যক, উর্দ্ধ, জ্যোতিষের সপ্তরেখা)। সপ্তব্রীহি—ব্রীহি, যব, মাষ, গোধুম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু।

আট—অষ্ট দিক্—(দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, বায়ু, অগ্নি, ঈশান ও নৈঋত। অষ্টযোগাঙ্গ—শম, দম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি। অষ্টবসু—ধর, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস। অষ্ট শিবমূর্ত্তি—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য ও যজমান মূর্ত্তি। অষ্টৈশ্বর্য্য বা অষ্টসিদ্ধি—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, ও কামাবশায়িতা। দিক্‌পাল—পূর্ব্ব দিকে ইন্দ্র, অগ্নিকোণে বহ্নি, দক্ষিণে যম, নৈঋতে নিঋত, পশ্চিমে বরুণ, বায়ুকোণে মরুৎ, উত্তরে কুবের, ঈশানে ঈশ। দিক্‌পতি—পূর্ব্বে রবি, অগ্নিকোণে শুক্র, দক্ষিণে মঙ্গল, নৈঋত কোণে রাহু, পশ্চিমে শনি, বায়ুকোণে চন্দ্র, উত্তরে বুধ, ঈশানে বৃহস্পতি। অষ্টগজ—ঐরাবত, সার্ব্বভৌম, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদণ্ড, সুপ্রতীক, পুণ্ডরীক। অষ্টনাগ (১) অনন্ত, বাসকী কম্বল ইত্যাদি ৮ নাগ। অষ্টধাতু—স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, সীস, তাম্র, লৌহ, রঙ্গ ও দস্তা। অষ্টব্রীহি—ব্রীহি, যব, মাষ, গোধূম, অণু, তিল, প্রিয়ঙ্গু ও কুলথ।

নূতন সংবাদ।

১। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কুর্জন সস্ত্রীক আগামী ২৮শে মার্চ্চ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া এপ্রেলের মধ্যভাগে সিমলায় উপনীত হইবেন। পথে দেশীয় শিল্পানুষ্ঠান সকল পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।

২। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মহামান্য ফর তিন ঘণ্টার পীড়ায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্থানে মুসিয়ার লোবে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

৩। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী ওবারটুন হলে কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি বোল্টন সাহেব সভাপতির কার্য্য করেন। সকল শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধিগণ বক্তৃতাদি দ্বারা উৎসাহদান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণার্থে প্রায় ৫০ হাজার টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৪। রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে কর্ম্ম হইতে অবসৃত হওয়াতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হিল সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাধিকা বাবু সুদীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন।

৫। রুষ ও চীনদিগের মধ্যে টাক্স লইয়া ঘোরতর বিবাদ হইয়া শতাধিক চীনেম্যান হত হইয়াছে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরীর আদেশে লেডি কুর্জন ভারতমুকুটে ভূষিত হইয়াছেন।

৭। ঢাকার নবাব স্যার আসানুল্লা বাহাদুর ভারত ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। সেক্সপিয়র, ৩য় ভাগ—শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত। মূল্য সুলভ সংস্করণ ১।০; রাজসংস্করণ ২৲ টাকা। কলিকাতা ১৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

তৃতীয় ভাগে সেক্সপিয়রের জগদ্বিখ্যাত হ্যাম্লেট্, জুলিয়াস সিজার, মাচ-এডু, আণ্টনি-ক্লিওপেট্রা, কিং জন, রিচার্ড দি থার্ড, য্যাজ ইউ লাইক ইট ও মিডসামার—এই আটখানি উপন্যাস ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট চিত্র আছে। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ অপেক্ষাও তৃতীয় ভাগ সেক্সপিয়রের আকার বাড়িয়াছে; মূল্য বাড়ে নাই।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকা, হারাণ বাবুর সেক্স্‌পিয়র অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যাঁহারা ক্রয় করিয়াছেন, তৃতীয় ভাগও তাঁহারা ক্রয় করিতে প্রলুব্ধ হইবেন। এমন সরল, মধুর ও অপূর্ব্ব বঙ্গানুবাদ বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরব। পাঠে মূল গ্রন্থের অপূর্ব্ব ভাব ও রস-মাধুর্য্য উপলব্ধি হয়। ভাষা এমন প্রাঞ্জল ও মিষ্ট হইয়াছে যে, পণ্ডিতে ও পুরনারীতে সমান আগ্রহে ইহা পাঠ করিবেন। একে জগতের মহাকবি সেক্স্‌পিয়রের অদ্ভুত কবিত্ব, তাহার উপর হারাণ বাবুর অমৃতময়ী-লেখনী-নিঃসৃত উপাখ্যানের সরসতা, মণি-কাঞ্চন যোগ হইয়াছে। হারাণ চন্দ্রের প্রতিভা যে সর্ব্বতোমুখী ও লিখনভঙ্গিমা যে অপূর্ব্ব, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।

২। মন্ত্রের সাধন—ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। মূল্য সুলভ সংস্করণ ৮৹ আনা; রাজসংস্করণ ১।৹ পাঁচ সিকা।

গ্রন্থের নাম শুনিবামাত্রই মনে যে গম্ভীর ভাবের উদয় হয়, গ্রন্থ পাঠ করিয়াও সেই ভাব মনে চির-জাগরূক থাকে। "বঙ্গের শেষ বীর" রচনায়, স্বদেশ-প্রেমিক হারাণ চন্দ্র যে বীণার ঝঙ্কার করিয়াছিলেন, "মন্ত্রের সাধনে" সে ঝঙ্কার শতগুণে উঠিয়াছে। এমন স্বদেশ-ভক্তিময় উদ্দীপনাপূর্ণ আদর্শ বীরচরিত্র,—এমন সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টির সহিত ইতিপূর্ব্বে আর কেহ কাব্য চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, বোধ হয় না। রাজপুত কেশরী প্রতাপ সিংহ এই গ্রন্থের নায়ক। তাঁহার স্বদেশ সেবা-ব্রতকে সাক্ষ্য করিয়া গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে—"মন্ত্রের সাধন"। কবিগণ বহু যত্নে যে আদর্শ চরিত্র চিত্রিত করেন,—পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপ—বিধাতার বরে সেই চরিত্র লইয়াই ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি ও ঔপন্যাসিক হারাণচন্দ্র অদ্ভুত প্রতিভা-বলে, সেই মহান্ চরিত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন অসামান্য কবিত্ব তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন। "মন্ত্রের সাধন" নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, দুর্ভাগ্য বাঙ্গালী-জন্মে ধিক্কার জন্মে। ইতিপূর্ব্বে এই প্রতাপ-চরিত্র লইয়া অনেকেই নাটক উপন্যাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু হারাণ বাবুর ন্যায় এমন তন্ময়ভাবে কেহ লেখনী ধারণ করেন নাই। তন্ময় হইয়া লিখিয়াছেন বলিয়াই হারাণচন্দ্রের প্রতাপ পাঠকের বুক চিরিয়া বুকে বসে। গ্রন্থে করুণরস ও বীররস এমন প্রগাঢ়রূপে প্রবাহিত যে, পাঠে প্রাণ গলিয়া যায়, কখন বা নির্জ্জীব প্রাণ সজীব হইয়া উঠে। বিশেষ হল্‌দীঘাটের যুদ্ধ নরোজামেণা, প্রতাপের একবার মাত্র পদস্খলন, পরার্থে একটী রাজপুত পুরোহিতের আত্মোৎসর্গ, নির্জ্জন পাহাড়ে প্রেমিক প্রেমিকার খেদোক্তি, এই সকল অধ্যায় বিশেষ দক্ষতার সহিত লিখিত।

যমুনা, কিরণময়ী, গঙ্গাবতী প্রভৃতি

স্ত্রী-চরিত্র-চিত্রণে কবির প্রখর অন্তর্দৃষ্টি ও [illegible] ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস যে, এমন সরস, সরল ও মনোজ্ঞ হইতে পারে—ইতিহাসের সকল কথা বজায় রাখিয়াও যে, এমন অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা রচিত হইতে পারে, হারাণ চন্দ্রই বঙ্গে তাহার পথ দেখাইলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। "মন্ত্রের সাধনে" যে কয়টি সঙ্গীত আছে, তাহাও অতি উৎকৃষ্ট। সঙ্গীত রচনাতেও যে হারাণচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব আছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। বিশেষ,

"সাধ্ জনমে প্রেম পাইয়ে,
সে প্রেমে বঞ্চিত যে,
আপনার চিতা আপনি সাজায়,
তার বাড়া দুখী কে।"

ইতিশীর্ষক গানটি এখনও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

হারাণ চন্দ্রের লেখনী-মুখে পারিজাত-বৃষ্টি হউক। "মন্ত্রের সাধন" বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করুক। বাঙ্গালী স্ত্রী, পুরুষ, এই গ্রন্থপাঠে জাতীয় চরিত্র গঠিত করুন। এমন উপদেশময়, সন্নীতি ও শিক্ষা পূর্ণ উপন্যাস, আমরা বহুকাল পাঠ করি নাই।

৩। হরিদাসী—এই জীবনী স্বর্গীয়া হরিদাসীর স্বামী বাবু গৌরীনাথ বসু হৃদয় খুলিয়া লিখিয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার গুণবতী ভার্য্যার অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার চরম অবস্থাতেও তাঁহার শান্তভাব, ঈশ্বরনির্ভর ও প্রফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার জীবনীতে তাঁহার আরও অনেক গুণ বর্ণিত আছে, যথা—ধর্ম্ম ও পরকালে বিশ্বাস, সহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা, শ্রমশীলতা, দীনতা, ভক্তিপ্রবণতা, কৃতজ্ঞতা, সরলতা, স্বাধীন ভাব, শান্তিপ্রিয়তা, সকলের প্রতি সদ্ভাব, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুরাগ, গুরু-ভক্তি, পতিভক্তি, ঋণভয়, বিলাসশূন্যতা, বিধাতার বিধাতৃত্বে দৃঢ় বিশ্বাস। এরূপ নারী যে স্ত্রীকুলের ভূষণ, তাহার সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় ত্রয়োবিংশমাত্র বয়সে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়াছে!

৪। স্ত্রী-চরিত্র—শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।৹ আনা। এই পুস্তকখানি স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে এবং ইহাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ে অনেক উপদেশ ও দৃষ্টান্ত আছে। দৃষ্টান্ত-গুলি স্বদেশ বিদেশ উভয় স্থান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পাঠক-পাঠিকাগণ যে বিশেষ উপকৃত হইবেন, বলা বাহুল্য। শ্রদ্ধাস্পদ মজুমদার মহাশয় ইংরাজীতে সুপণ্ডিত এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও বাগ্মী। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার শুভাগমনে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম। তাঁহার মত সুযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন হইবে, ইহা আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি।

বামারচনা।

কেন?

শূন্য মরুভূমি প্রাণে,
কেন দুদিনের তরে,
ফুটিয়া কুসুম তুই
দুদিনেই গেলি ঝরে।

আঁধার সংসার পথে
কেন তুই শুকতারা,
দেখা দিয়ে ডুবে গেলি
আঁধার করিয়া ধরা।

অন্ধ এ নয়ন তলে
উষার আলোক এসে,
ছড়ায়ে মুহূর্ত্ত জ্যোতি
মিশালি আবার শেষে।

পড়িয়া সুধার কণা
কোন্ স্বর্গ পথ হতে,
বাসনার রাশি মোর
দলে গেলি অকালেতে।

তোরে পেয়ে সপ্ত স্বর্গ—
কি ছিলিস মোর তুই,
আজি প্রাণ কিছু নয়—
শূন্য মরু ভুমি বই।

শ্রীসরোজ কুমারী দেবী।

সে দিন।

তেমনি ত বহিছে তটিনী;
শাখা পরে বিকাশে পল্লব।
চুম্বিতেও শ্যামল ধরণী,
ঝরে পড়ে কিশলয় দল॥
তেমনি ত আকাশ ললাট,
জ্বলে উঠে উষার চুম্বনে।
শ্যাম হাসি হাসিতেছে তট,
তরঙ্গের মর্ম্ম কথা শুনে॥
তেমনি ত অনিল-কাহিনী
শুনিয়া অরণ্য উঠে কাঁদি।
হৃদয়ে শিহরে প্রতিধ্বনি,
শবদ যখন উঠে ডাকি॥
সব আছে তেমনি হেথায়ে,
শুধু হায়! সে দিন গো নাই।
ম্লান মুখে স্মিরিতি শুধায়—
সে দিনের সে স্বপন কই?
যে মোহন সুবর্ণ স্বপন,
সে দিনেরে ছিল পর্ণ করি,
শুধু তার ছায়াটি এখন,
কাঁদে হায় সদা মোরে ঘেরি॥
চলে গেছে সে দিনের সাথে
পরিচিত জীবন আমার।
এবে হায়! যাহা কিছু আছে,
মনে হয় সব অচেনার॥
এদিনের কত হাসি খেলা,
আমারে গো নিত্য রহে ঘেরি।
প্রাণ সব করি অবহেলা,
সেদিনের পানে রহে ফিরি॥

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসু।

সে যে স্বরগের ফুল।

সে যে স্বরগের ফুল ;
কিবা রূপ মনোহর শোভায় অতুল ;
কি জানি কিসের তরে, অমর উদ্যান ছেড়ে,
এসে এই ধরাপরে হইল মুকুল ;
হায় ! সে যে পারিজাত ফুল।

সে যে পারিজাত ফুল।
বুঝি কোন্ দেববালা করি মহা ভুল,
কুসুমটি হাতে করে, ফেলেছিল ধরাপরে,
তাই সে এখানে পড়ে হইল মুকুল,
জনমিল ধরাতলে পারিজাত ফুল।
সে যে স্বরগের ফুল।

সে যে মন্দারের ফুল,
মর্ত্ত্যে এসে জনমিল হইয়া মুকুল,
যে ফুল ত্রিদিবে রাজে, তাহা কি মরতে সাজে ?
দেখিবারে পাইলেন শেষে দেবকুল,
সে যে মন্দারের ফুল।
মর্ত্ত্যে স্বরগের ফুল,
দেখিয়া ত্রিদিববাসী হলেন আকুল,
একদিন নিশাশেষে, ছিনু আমি নিদ্রাবেশে,
সে সময়ে গুপ্তবেশে আসি দেবকুল,
ছিঁড়ে লয়ে গেল মোর সাধের মুকুল।
হায় সে যে স্বরগের ফুল !

সে যে স্বরগের ফুল !
কি মোহের ঘোরে মোর হয়েছিল ভুল !
চিনিতে নারিনু হায়, যতনে রাখিনু তায়,
(কিন্তু) দেবগণ লয়ে তারে গেল সুরপুর,
অভাগী-হৃদয় হায় করে গেল চুর।
সে যে স্বরগের ফুল।

শ্রীমতী নী বসু।

প্রার্থনা।।

(১১ই মাঘ ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে)

অদ্যকার প্রভাত আমার কাছে কি মধুর বোধ হইতেছে। শত শত নর নারী তোমার পূজার জন্য কত দূর দূরান্তর হইতে একত্র সমবেত হইয়াছে, যাহার যাহা সাধ্য তাহা লইয়া আসিয়াছে, তোমার চরণে দিয়া ধন্য হইবে, শত শত নর নারী তোমার পূজা করিতেছে, কি মনোহর দৃশ্য ! আমি মানস চক্ষে দেখিতেছি, আর আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। এ দিকে আবার প্রকৃতিদেবী তোমার পূজার আয়োজন করিতেছে, প্রভাতের মলয়ানিল তোমায় চামর ব্যজন করিতেছে—প্রভাত সমীরণস্পর্শে কাননে কুসুম ফুটিয়া তোমার চরণে আপনাকে অর্পণ করিয়া তাহার ক্ষুদ্র জীবন সার্থক করিতেছে, পক্ষীরা উষা দেবীকে দেখিয়া নীড় পরিত্যাগ করিয়া তোমার নাম গান করিতেছে। হে পরমাত্মন্ ! এমন সুন্দর প্রভাত সমীর-

স্পর্শে আমার হৃদয়-কাননের কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে ; নাথ! মধ্যাহ্ন কালের আতপতাপে মলিন হইয়া যাইবে, সেই জন্য আমি বহুযত্নে কুসুমগুলিকে চয়ন করিয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইয়াছি। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা তোমার পূজার কত না আয়োজন করিয়াছেন, আমার যে আর কিছুই নাই, আমি যে তোমার ধনহীনা তনয়া, আমার শুধুই ব্যাকুলতা ও আমার বহুযত্নের ফুলগুলিতে ভক্তি চন্দন মিশ্রিত করিয়া নয়নজলের সহিত তোমার চরণতলে অর্পণ করিতেছি, গ্রহণ কর, আমার জীবন সার্থক হউক। হে মহিমাময়! তুমি আমাদের অন্তরে বাহিরে বিরাজিত রহিয়াছ, মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া আত্মস্থ হইয়া আমরা যখন তোমাকে দেখি, তখন দেখি তুমি আমাদের আত্মাতে আত্মারাম হইয়া বিরাজিত রহিয়াছ, তখন আমরা "দ্বাসুপর্ণা" ঋষিবাক্যের অর্থ সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধি করিয়া থাকি। তুমি আমাদের আত্মাতে সখারূপে রহিয়াছ। আবার যখন মোহ-আবরণ সরাইয়া তোমার জড়জগতে দৃষ্টিপাত করি, তখন তোমাকে মহিমাময় পিতারূপে বিরাজিত দেখিতে পাই ; এবং "কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি" অনুভব করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকি। এই শস্যশালিনী বসুন্ধরা শ্যামল নবদূর্ব্বাদল বিস্তৃত ; তাহার বক্ষে তোমার সিংহাসন পাতা রহিয়াছে, আর তুমি তাহাতে মহারাজাধিরাজ-রূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছ, বিহগে তোমার স্তুতি গান করিতেছে। যখন আবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি, অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র-শোভিত নীল চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। তোমাকে যখন যে ভাবে দেখি মুহূর্ত্তের জন্য আপনাকে ভুলিয়া অবাক্ হইয়া থাকি, তুমি আমাদের মাতা পিতা ও রাজারূপে হে অনন্তস্বরূপ অন্তরে বাহিরে বিরাজ করিতেছ ও এই জগতে ওতপ্রোত ভাবেও অবস্থান করিতেছ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা অজ্ঞান অন্ধকারে কূপ-মধ্যস্থিত ভেকের ন্যায় বাস করিতেছি, আমাদের মোহ-আবরণ দূর করিয়া দাও, আমাদের হৃদাকাশে জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হউক, অন্তরে বাহিরে তোমাকে দেখিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক হউক। দয়াময়! আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু সকলই দিয়াছ, চাহিবার তো কিছুই নাই। আমরা তোমায় ছাড়িয়া সুখ-অন্বেষণে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হই। আর যেন তোমায় ছাড়িয়া না ভ্রমি, অমৃতের সাগর ছাড়িয়া বিষে অবগাহন না করি, এই তোমার চরণে করযোড়ে ভিক্ষা চাই। শ্রীইন্দিরা।

মাঘোৎসব উপলক্ষে।

আবার আসিল ঘুরে সম্বৎসর পরে,
প্রিয়তম মাঘোৎসব আমাদের তরে।
প্রিয় মাঘোৎসব এল মোদের কারণ,
করিব কি মহোৎসব আমরা এখন?

দুর্গোৎসব, দীপান্বিতা, দোল, গোষ্ঠ, রাস,
হিন্দুদের পর্ব্ব পূজা কতই উল্লাস।
শঙ্খ, ঘণ্টা, ঢাক, ঢোল, আমোদ আহ্লাদ,
নৃত্য গীত শেষে হায় ঘোর অবসাদ!
নহে ওপ্রকার আমাদের মাঘোৎসব;
বাহিরে কিছুই নাই ভিতরের সব।
মনের ব্যাপার ইথে এ উৎসব সনে।
সব ফেলে মন গড়া চাই সে কারণে।
আমাদের পাপমতি হিংসা দ্বেষ ভরা।
আমরা হয়েছি হায় জীবনেতে মরা।
হরিনাম হরিকথা করিয়া বিদায়;
পরনিন্দারূপ মালা আমাদের হায়!
ভাঙ্গা ঘর ছেঁড়া কাঁথা শাক অন্নসার।
গরবে ধরারে সরা ধারণা আবার।
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানে সদা ভাবি হাম্‌বড়া,
ধার্ম্মিকা আমিই বড় ভেবে দিশাহারা।
এ বয়সে কত বার বরষে বরষে,
যতন করিনু মন ফিরাবার আশে।
কিছুইতো হইল না—ফিরিল না মন,
পূর্ব্বেও যেমন ছিল আজিও তেমন।
উৎসাহ উদ্যম তেজ ভাল হব আশা,
পূর্ব্বেতে যা ছিল কিন্তু এবে কর্ম্মনাশা
সংসার নদীর হায় ভীষণ তরঙ্গে
কোথায় ভাসিয়া গেছে কালের প্রভঙ্গে।
সংসার করমক্ষেত্র ধরমমন্দিরে,
অতি সূক্ষ্ম কাপটোর বসন শরীরে
ঘেরা সদা; আমাদের নিকট মরণ
হইতেছে এত, তাহা ভাবি না কখন।
নারিবে না বুঝিবারে কেহ কভু হায়,
আমরা অমর জীব কাজে ও কথায়।

এই দশা আমাদের আমরা কেমনে,
করিব ব্রহ্মের পূজা ভাবি তাই মনে।
শুনিয়াছি সাধু মুখে পুরাণে কোরাণে,
সুনির্ম্মল চিত্ত চাই ব্রহ্ম-পূজা ধ্যানে।
দীনবেশে ম্লান মুখে অনুতপ্ত মনে
ব্রহ্মকৃপা ভিক্ষা লহ ভাই ভগ্নী সনে,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ দমি রিপুগণে,
এক মনে এক প্রাণে বসি যোগাসনে;
ভক্তিযোগে ব্রহ্মপদ করিলে চিন্তন,
তবে ব্রহ্ম স্বরূপেতে হইবে মগন!
এরূপ না হলে যদি ব্রহ্ম-উপাসনা
নাহি হয় করা, তবে মোদের ললনা
কি হবে উপায়? তবে কি হইবে গতি?
একেতে হয়েছি মরা আরো অধোগতি
হইবে কি দীননাথ? পতিতপাবন!
তুমিহে অখিলপতি কাঙ্গাল শরণ,
ধুয়ে দাও পাপ মলা; তোমার পূজায়
বসাও আমারে যেন আর কভু হায়!
নাহি যাই পাপপথে; তোমার কথায়
থাকি যেন দিবা নিশি হেথায় সেথায়।
এই ব্রহ্মোৎসব যেন নিত্যোৎসব হয়।
এ উৎসবে চিত্ত যেন চিরমগ্ন রয়।
তোমার সংসার ভাবি সংসারের কাজ
করি যেন, আশীর্ব্বাদ কর বিশ্বরাজ!
ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা নামে এখন যেমন
উপহাসে দেখে সবে মন্দ আচরণ।
এ উৎসব হতে যেন আর তাহা কভু
না পারে ঘটিতে, তাই কর মহাপ্রভু!

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী,
কাকীনা।

সঙ্গীত।

সুর—মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।

ওরে আমার মন ভ্রমরা!
কেনরে বেড়াস ছুটে হয়ে পাগলপারা।
মধুপান করবি বলে, সংসার মোহফুলে,
ছুটাছুটি করে শেষে হস্ দিশাহারা।
এ ফুলে মিলে না মধু, দেহ হয় ক্ষত শুধু,
ব্রহ্ম-পাদপদ্মে যা'রে; দেখবি শুধু মধুভরা;
ফুরাবে না পেট ভরে, মনের সুখে খেয়ে নেয়ে,
খেতে পাবি, দিতে পারবি, হবি প্রেমে মাতোয়ারা।
ও চরণ সরোজে বসি, পিও মধু দিবানিশি,
পাবি সুখ অবিনাশী, পদছায়া দুঃখহরা।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী।

সুর—প্রেম বিনে কি সে ধন মিলে।

মন কেন দুর্ম্মতি এমন!
পুজিলি না ভজিলি না, বিভুর চরণ।
দেখিতেছ যত সব, হইলে এ দেহ শব,
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, বিনে সে পরম ধন।
সংসার মোহ আঁধারে, দিবা নিশি ঘুরি পড়ে,
এখন সময় আছে কর হরি নাম সাধন।
সে হরি আলো আঁধারে, প্রাণ খুলে ডাক তাঁরে,
ভব তাপ যাবে দূরে, ঘুচিবে ভববন্ধন।
মোক্ষদা, মোক্ষদা মারে, আর ভুলে থেক নারে।
মোক্ষধন হৃদে ধর, মোক্ষদ মায়ের চরণ।

প্রাণের পূজা।

আমি—সকল ভুলিয়ে, তোমার লইয়ে,
হইব উদাসী সন্ন্যাসী।
গহন কাননে, খুঁজিব রতনে
ডাকিব কলুষবিনাশি।
নিশিতে দিবসে, পূজিব আবেশে
ভাসিব ভকতি-হিল্লোলে।
দিয়ে—প্রেম কোকনদ, পূজিব শ্রীপদ
প্রীতিফুল আঁখি সলিলে।
তুলসী জীবন, হৃদয় চন্দন,
সৌন্দর্য্যেতে দীপ জ্বালিব।
অর্ঘ্য দিব মন, নৈবেদ্য যৌবন,
কাম ক্রোধ বলি দানিব।
প্রবৃত্তি সকলি, হইবে অঞ্জলি,
বিল্বপত্র হবে বাসনা।
শুভ্রতা বসন, করিয়া ধারণ,
করিব শ্রীপদ অর্চ্চনা।
ভক্তি মনে মেতে, পাখীর সঙ্গীতে
শুনিব সঙ্গীত তোমারি,
বসিয়া বিরলে, কুসুম কোমলে,
(প্রভু হে!) হেরিব তোমার মাধুরী।

স্বভাব শরীরে হেরিব তোমারে,
হয়—তোমারই শ্বাস সমীরণ।
পুষ্পিত লতিকা, শারদ চন্দ্রিকা,
তোমারই দেব-শরীর।
নির্ম্মল আকাশে, ললাট প্রকাশে,
কেশরাশি ঘন নিকর।
নীল সরোবর, আঁখি মনোহর,
বালার্ক কিরণ অধর।
পাদপ শ্যামল, বাহু সুকোমল,
ধরাধর পদ যুগল।
রবির কিরণ, তোমার বরণ,
শশধর মুখকমল।
কমল কোমল, তোমারি কপোল,
নব ঘন নেত্র নীলিম।
চন্দ্রাতপ তলে, তব গৃহ জলে
সকলি তোমার অসীম।
জাহ্নবী যমুনা, কালিন্দী শোভনা,
তব আভরণ স্বরূপ।
সকলি তোমার, সুধার আধার,
কেবলে হে তুমি অরূপ?
নিশিতে চাঁদিয়া, দিতেছে জ্বালিয়া,
সুবর্ণ প্রদীপ শীতল,
নবীন বল্লরী, রেখেছে বিস্তারি,
তোমার ব্যজন শ্যামল।
এ অনন্ত ধরা তোমাতেই ভরা,
তোমাতেই তোমা হেরিব।
প্রভু।—তোমার এ প্রাণ, তোমাকেই দান
তোমার আজ্ঞায় করিব।

অমূজা সুন্দরীদাস
"প্রীতি ও পূজা" রচয়িত্রী।

শেষ কথা।

যেতে হবে যেতে হবে দূর দূরান্তর মাঝ,
শেষ বিদায়ের কথা বলিতে এলাম আজ।
যেতে হবে বেলা শেষে যখন নিভিবে রবি,
খেলা ধূলা হবে শেষ আমার জুড়াবে সবি।
ভেবেছিনু রেখে যাব স্নেহের প্রতিমাগুলি,
দারুণ নিঠুর কাল আগে সবে গেছে দলি।
অফুট কুসুম সম, কোমল শিশুর কায়,
কঠিন ধরণীতলে শয়ান রয়েছে হায়!
এই শেষ সাধ সখা, মিটাইও এ আশায়,
'সেই' নদী তটে মোর দগ্ধ কোরো এই
কায়।
দারুণ হিয়ার জ্বালা নিভাইও বহ্নিতাপে,
পূত জাহ্নবীর জলে মুছে ফেল সব
পাপে।
রোপিও অশোক বৃক্ষ চিতার শিয়র পরে,
অশোক সুখের কথা সেখানে শুনাবে
মোরে।
যবে সব শেষ হবে মনে রেখ এই স্মৃতি
ছিলাম তোমারি আমি তোমাতেই স্নেহ
প্রীতি।

পঙ্কজ কুমারী দেবী। *

---

* এই রমণী কবিত্বশক্তিসম্পন্না ছিলেন—ফুটিতে না ফুটিতে ১৬ বর্ষ বয়সে কালক্রোড়ে অদৃশ্য হইয়াছেন। ইতিমধ্যে দুইটী কন্যার বিয়োগশোক পাইয়া গিয়াছেন। সুখের বিষয়, ইঁহার শক্তি ইঁহার সহোদরা "হাসি ও অশ্রু" রচয়িত্রী সরোজ কুমারীতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বা, বো, স।

No. 410-11 March & April, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪১০-১১ সংখ্যা। | ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩০৫—মার্চ ও এপ্রেল ১৮৯৯। | ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সিমলা যাত্রা—গত ৫ঠা মার্চ্চ লেডী কুর্জন সদল সন্তানগণ সহিত সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। লর্ড কুর্জন হাবড়া পর্য্যন্ত গিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়াছেন।

কালা বোবা বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ড—ঈশ্বরেচ্ছায় এই ফণ্ডের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। ইহাতে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ দান করিয়াছেন—

ভাওয়ালের মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ	৫০০০,
মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী	৬০০০,
মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী	১০০০,
দ্বারবঙ্গের মহারাজা	১০০০,
নবাব বাহাদুর আসানুল্লা, ঢাকা	৩০০০,
রায় কমলেশ্বরী প্রসাদ সিং বাহাদুর মুঙ্গের	৫০০০,

নূতন রেলওয়ে—গত ৬ই মার্চ্চ হইতে বি এন রেলওয়ের গাড়ী কলিকাতা হইতে কটক হইয়া জগন্নাথপুরীতে যাইবে। ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৩৸/১০ মাত্র। আপাততঃ রূপনারায়ণের ধার কোলা পর্য্যন্ত ষ্টিমারে যাইতে প্রায় ৯ ঘণ্টা এবং তথা হইতে পুরী যাইতে ২৪ ঘণ্টা লাগিবে।

কাউণ্টেস কানাভারো—এই মাননীয়া মহিলা সিংহল হইতে সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বিনী হইলেও সকল ধর্ম্মের প্রতি উদারহৃদয়া ও শ্রদ্ধাবতী। ইহাঁর দ্বারা ভারতের উপকারের আশা করা যায়।

লেডী ডফরিণ হাঁসপাতালের বার্ষিক অধিবেশন—গত ৩রা মার্চ্চ ইহার চতুর্দ্দশ বার্ষিক অধিবেশন অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। বড় লাট ও ছোট

লাট সস্ত্রীক উপস্থিত হন। কলিকাতার দেশীয় বিদেশীয় প্রায় সকল মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

আমেরিকার জয়—যুক্তরাজ্যের সৈন্যেরা ফিলিপাইন পুঞ্জের সিবুদ্বীপ অধিকার করিয়া দুর্গোপরি জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছে। বিদ্রোহীরা পাহাড়ে গিয়া লুকাইয়াছে।

এলাহবাদ বিশ্ববিদ্যালয়—উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট সার এণ্টনি ম্যাক ডোনাল্ড—গত ৮ই মার্চ্চ উপাধি বিতরণ সভায় সভাপতিত্ব করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

স্ত্রী উকিল—কুমারী কর্ণেলা সরাবজী বি, এ, উঃ পঃ প্রদেশের আদালতের উকিল শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইনি অতি সু-শিক্ষিত এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহার সিদ্ধি কামনা করি।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ছয় বৎসর পূর্ব্বে যে লোক সংখ্যা গণনা হয়, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের চাকরাণীর কাজ ভিন্ন অন্য ব্যবসায় ছিল না। গত আদমসুমারীতে প্রকাশ ৬১ হাজার স্ত্রীলোক পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারিণী, ৭০ হাজার ছাপাখানায় কাজ করে, ৩০ হাজার ডাক বিভাগে কেরাণী ইত্যাদি, ১ লক্ষ ৩০ হাজার শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী (ইহাদের সংখ্যা পুরুষশিক্ষকের তিনগুণ), ৪ হাজার ৭ শত ২১ জন গণিতে কাজ করে এবং ২০০ শত স্ত্রীলোক গবর্ণমেণ্ট আফিসে টাইপ লেখিকা।

মহারাণীর পৌত্রশোক—মধ্যম রাজকুমারের একমাত্র পুত্র স্যাক্সকোবর্গের প্রিন্স আলফ্রেড ২৪ বৎসর বয়সে লোকান্তর-গত হইয়াছেন। মহারাণীর পারিবারিক দুর্ঘটনায় প্রজামাত্রেই শোকার্ত্ত।

লণ্ডনে মৃত্যু—লণ্ডনে একসপ্তাহে ইনফ্লুয়েঞ্জা পীড়ায় ৫২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। লর্ড জষ্টিস চিটী এই রোগে মরিয়াছেন।

বাঙ্গালায় জন্মমৃত্যু—১৮৯৭-৯৮ সালে বঙ্গদেশে ২৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮২৪টী লোক জন্মিয়াছে এবং ২৩ লক্ষ, ১১ হাজার ৩৩২ লোক মরিয়াছে। মৃত্যু সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে অধিক।

লেডী কুর্জনের আত্মীয়গণ—লেডী কুর্জনের মাতা ও ভগিনীরা ভারত দর্শনে আসিতেছেন। লেডী কুর্জন আমেরিকার মেয়ে, এদেশের মহিলাগণের সহিত ইতিমধ্যে বেশ মিশিয়াছেন। তাঁহার কুটুম্বগণের আগমনও শুভজনক হইবে আশা করা যায়।

পৃথিবীর লবণ ভাগ—কোনও বৈজ্ঞানিক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে পৃথিবীর নদনদী সমুদ্র প্রভৃতিতে যে লবণ মিশ্রিত আছে, তাহা কোনও প্রকারে উদ্ধার করিতে পারিলে সমুদায় পৃথিবীর

পৃষ্ঠোপরি ১০০ ফিট উচ্চ লবণ স্তর সঞ্চিত হয়।

ব্যারণ রয়টার—ইনি পৃথিবীব্যাপী তারের সংবাদ চালনার প্রথম প্রবর্ত্তক, সম্প্রতি পরলোক গত হইয়াছেন। ইনি ১৮৭১ সালে লণ্ডনে বাস স্থাপন করেন এবং জর্ম্মণ ডিউক কর্ত্তৃক "ব্যারণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বয়স ৮১ বৎসর হইয়াছিল।

রস্কিনের জন্মদিন—বিলাতের মহাজ্ঞানী রস্কিনের বয়স ৮০ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে যুবরাজ এবং বিলাতের অনেক মহাপণ্ডিত ব্যক্তিসকল তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

দেবল রাজ।

(৮)

আমরা দেবলকে কখন কখন দেবনাথ বা দেবনাথ পাল বলিয়া সম্বোধন করিব। তাহাতে বোধ হয়, পাঠকগণ কোনও দোষ লইবেন না। বুড়োশিবের মেলায় দেবনাথ বেচা কেনা শেষ করিয়া চৌপালে চড়িয়া বাড়ী আসিলেন এবং জননীর সঙ্গে যেরূপে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, জননী তাহাতেই বিস্মিতা হইয়াছিলেন। তাহার পর, যখন, সেদিনকার বেচাকেনার কথা, বুড়োশিবের কথা এবং মামার বাড়ীর কথা পুত্রমুখে শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়াছিল। দেবনাথের তহবিল হইতে সেই মোহরটী লইয়া তাহাতে সিন্দুর চন্দন মাখাইয়া যত্নপূর্ব্বক তুলিয়া রাখিলেন এবং ঐ মোহর কস্মিন্‌কালে ব্যয় না করেন, দেবনাথকে সেই মর্ম্মে উপদেশ প্রদান করিলেন। বিক্রয়লব্ধ টাকা পয়সা হইতে যথাকালে বুড়োশিবের পূজা দিবার জন্য একটী টাকা ও চারি আনা পয়সা তুলিয়া রাখিলেন।

ঊনবিংশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত দেবনাথ কালেভদ্রে মাতুলালয়ে যাইতেন। তাহার পর তিন বৎসর যাবৎ একবারে মাতামহালয়ে গমন করেন নাই, সে কথা মেলার দিন তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুলের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু দেবনাথ কি কারণে মাতুলালয় সম্বন্ধে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, বোধ হয়, পাঠকগণ এখনো তাহা বিশদরূপে বুঝিতে পারেন নাই। একবার পূজার পর বিজয়া দশমীর দিন দেবনাথ দশমী-কৃত্য করণোদ্দেশে মাতুলালয়ে গমন করেন। সে যাত্রা দুই চারিদিন তথায় ছিলেন। মাতামহী, গৃহস্থ সমস্ত পুরুষগণকে এক গৃহে ভোজন করাইতেন। দেবনাথও সেই সঙ্গে ভোজন করিতেন; কেবল তাঁহার কনিষ্ঠ মাতুল সে গৃহে ভোজন

করিতেন না। আপনারা "বড়লোক" বলিয়া কনিষ্ঠ মাতুলের মনে বিলক্ষণ অভিমান জন্মিয়াছিল, কেননা তাঁহার কিছুমাত্র সুশিক্ষা ছিল না। উপরি উক্ত গৃহে স্বজনগণের সহিত ভোজন না করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, বলিয়াছিলেন, "হাঁড়ীগড়া ছোট জাতের সঙ্গে এক ঘরে আহার করিলে মান থাকে না।" ভোজন-গৃহে দেবনাথ ভিন্ন "হাঁড়ীগড়া ছোট জাত্" আর কেহ ছিল না। কনিষ্ঠ মাতুলের এই অযোগ্য ও অসঙ্গত বাক্যই, দেবনাথের মাতুলালয় সংশ্রব পরিত্যাগের হেতু হইয়াছিল।

দেবনাথ-জননী পঞ্চ ভ্রাতার প্রিয়া ভগ্নী একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই ভগ্নী সম্বন্ধে দেবনাথও মাতামহ ও মাতুল গোষ্ঠীর পরম প্রিয় ও স্নেহাস্পদ ছিলেন। ছোট বাবুর "বাঁদরামি বাক্যে" সেই দেবনাথ মামার বাড়ী যাতায়াত ত্যাগ করিয়াছেন, ক্রমে এই ঘটনা মাতুলালয়স্থ সকলেরই বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠিল। একেই নীচ কর্ম্ম করেন বলিয়া দেবনাথ প্রায়ই চৌবেড়ে যান না, তাহার উপর এই কথা। দেবনাথের এরূপ উৎকট অভিমান হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই ঘটনায় মাতামহ রাজারাম পাল মনে বড়ই ব্যথা পাইয়াছিলেন। একদিন কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, সে যদি দেবনাথকে তাঁহার নিকট আনিয়া না দেয়, তবে তিনি তাহার মুখ দেখিবেন না। কনিষ্ঠ পুত্র পিতার এই তিরস্কারে অতীব ব্যথিত ও ভীত হইয়া দেবনাথের সন্ধান আরম্ভ করিলেন। পরে কিরূপে এবং কোথায় দেবনাথকে "গ্রেপ্তার" করিয়াছিলেন, সপ্তমাধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

দেবনাথ মাতৃসমীপে মেলার দিনকার সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"মা, চৌবেড়েত তোমার বাপের বাড়ী, —অবশ্যই বুড়োশিব দেখিয়াছ। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে দশ হাত অন্তরে একটা চৌকোণা গহ্বর ও তার মধ্যে সিঁড়ি আছে, দেখিয়াছ কি?"

জননী কহিলেন—

"কতবার দেখিয়াছি, কেন?"

গহ্বরের মধ্যে কি আছে; আর ঐ সিঁড়ি দিয়া ভিতরে নামা যায় কিনা, বলিতে পার?"

"কেন? তুমি উহার মধ্যে নামিবে নাকি?"

"সেই জন্যইত জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

আমার পায়ে হাত দিয়া শপথ কর,—কখনো উহার নিকটে যাইবি না,—তবে উহার কথা বলিব। ওটা গহ্বর ত নয়, যমপুরী। শুনেছি, তোর মত ডাংপিটে দুই চারিটা ছেলে উহার মধ্যে নামিয়াছিল,—কিন্তু আর উঠে নাই।"

"ছেলেগুলা নামিল,—উঠিল না, কেহ তার সন্ধানও করিল না?"

"একেবারে কি দুই চারিটা নামিয়াছিল —তাহা নহে। উহার ভিতর কি

আছে, দেখিবার জন্য আগে এক জন নামিল,—আর উঠিল না। তার সন্ধানে আর একজন নামিল,—সেও উঠিল না। এইপ্রকারে পূর্ব্বকালে ঐ গহ্বরে চারিটী প্রাণী নষ্ট হইয়াছিল। সেই অবধি এদেশের লোক উহার নিকটে ঘেঁসে না,—উহাকে যমালয়ের মত ভয় করে।"

"আমি যে আজ শুনে এলাম,—উহার মধ্যে একটি সন্ন্যাসী বাস করেন;—কখনো কখনো দশ পনর দিন, কি মাসেক অন্তরে বাহির হয়ে গ্রাম মধ্যে ভিক্ষা করেন।"

"সাধু-সন্ন্যাসী-যোগী-মোহান্তের অসাধ্য কি আছে? তাঁহারা ইচ্ছায় মরিতে পারেন,—ইচ্ছায় বাঁচিতে পারেন। পাখীর ন্যায় আকাশে উড়িতে পারেন,—জলের উপর দিয়া খড়ম পায়ে চলিয়া যাইতে পারেন। কখনো গোরু,—কখনো বাঘ, কখনো সাপ, কখনো বা অদৃশ্য পোকামাকড়ের আকার ধরিতে পারেন। তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দাও।"

"মা বুড়োশিব তলায় আজ আর একটা কাণ্ড দেখে এলাম।"

"কি বল দেখি?"

"মন্দির ও গহ্বরের মধ্যে যে জায়গা ছিল, তাহাতে "ঘাঁটাঘুঁটের" পর্ব্বত। গহ্বর ও ঐ স্থানটা এক দম্ জঙ্গলে ঢাকা, এ জন্যে প্রায়ই সে দিকে কেহ যায় না। কেহ কদাচ গহ্বর দেখিতে যায়, অনেকেই বলিল, এক রাতে ঐ ঘুঁটের পর্ব্বতটা মাটীর ভিতর থেকে বাহির হয়েছে।"

দেবল জননী কহিলেন,—

"দেবল, দেবতার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে। ইন্দ্রের পুরী শ্মশান হতে পারে,—সমুদ্র শুকিয়ে বালি উড়িতে পারে;—তোমার এই খড়-উড়া কুঁড়ে ঘরখানি রাজপুরী হতে পারে। বুনো বুড়োশিব, কি না করিতে পারেন? তাঁর মত 'জাগ্রত ঠাকুর' কোথাও নাই। কিন্তু আমার বোধ হয়, সন্ন্যাসী ঠাকুরই রান্নাবান্নার জন্যে ক্রমে ক্রমে ঘুঁটে সঞ্চয় করেছেন।"

(৯)

দেবনাথ পালের গৃহে দুইখানি বাঙ্গালা ঘর এবং দুইখানি বাঙ্গালা চালা। বর্ত্তমান কালের চৌকীঘর (চুমরী) ও দোচালার যেরূপ গঠন হইয়া থাকে, সেকালের বাঙ্গালা ঘর ও চালার গঠন সেরূপ ছিল না। তখন তিনখানি মাত্র চালে প্রকাণ্ড বাসগৃহ নির্ম্মিত হইত। চাল তিনখানি চতুর্থীর চন্দ্রকলাবৎ বক্রাকারে নির্ম্মিত ও ভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত হইত। সেরূপ চালের ঘর নিতান্ত মন্দ দেখাইত না, তথাপি কাল-ভেদে রুচিভেদবশতঃ এখন সেরূপ ঘর প্রায় দেখা যায় না। নিতান্ত পল্লীগ্রামে ঐরূপ ঘর, হয়ত অদ্যাপি দুই একখানা থাকিতেও পারে। এখন তদ্রূপ এক-খানা ঘরে পাঁচখানা চাল দেওয়া হইয়া থাকে। দেবনাথের বাসগৃহ দুইখানির একখানি পূর্ব্বদ্বারী, ও একখানি দক্ষিণ-দ্বারী। চালা দুইখানির একখানিতে

পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইত। অপরখানির চতুর্দ্দিক্ প্রায় অনাবৃত, দৈর্ঘ্য প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত। তাহার অর্দ্ধাংশে চাকঘর ও অর্দ্ধাংশে পোঁয়ান ঘর। চাকঘরে হাঁড়ি কলসীর গড়ন হইত, পোঁয়ান ঘরে সেই সকল মৃৎপাত্র পোড়ান হইত। মাটী কাটা মুড়ি কোদাইলখানি কখনও চাক ঘরে, কখনও বা পোঁয়ান ঘরে পতিত থাকিত। তৎসঙ্গে কাষ্ঠ কর্ত্তনের কুঠার, দা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রও ঐ দুই ঘরের যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত।

সপ্তম অষ্টমাধ্যায়ে যে দিনকার ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সেই দিন হইতে গণনা করিলে যে দিন এক পক্ষ শেষ হয়, সেই দিন অতি প্রত্যূষে দেবনাথ-জননী চাক-ঘরে গমন করিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিলেন। দর্শন করিয়াই শশব্যস্তে নিদ্রিত দেবনাথকে ডাকিতে লাগিলেন। জননীর আহ্বানে দেবনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল। না জানি কি বিপদ্ উপস্থিত ভাবিয়া, দেবনাথ সত্বরপদে জননীর নিকটস্থ হইলেন। জননী অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেবনাথকে পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনা দেখাইলেন। দেবনাথ দেখিলেন, চাক্ঘরের মধ্যে একটী ঝোলা আড়ায় ঝুলিতেছে। গতরাত্রে বৃষ্টি হইয়াছিল, চালের ছিদ্রপথে জল পড়িয়া সেই ঝোলা ভিজিয়াছে। ঝোলার নিম্নভাগ হইতে ফোঁটা ফোঁটা বারি তখনও গৃহতলে পড়িতেছে। চাকঘরের যেখানে ঝোলায় জল পড়িতেছিল, ঠিক্ সেই স্থলে একখানি টক্‌টকে সোণার মুড়ি কোদাল ও একখানি সোণার দা পড়িয়া আছে। সদর রাস্তায় ধারে অনাবৃত চালা ঘরে সোণার কোদাল ও সোণার দা দেখিয়া জননী পুত্র দুইজনেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। "ঝোলা দেখ!" হঠাৎ এই শব্দটা যেন দেবনাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। দেবনাথ তৎক্ষণাৎ ঝোলাটী পাড়িয়া দেখিলেন, তন্মধ্যে এক খণ্ড আগুণ জ্বলিতেছে! আগুণের আর একটী বিশেষ গুণ দেখিলেন, ঝোলার সকল দ্রব্যাদি ভিজিয়াছে,—সে অগ্নিখণ্ডও ভিজিয়াছে,—তথাপি তাহা নির্ব্বাণ হয় নাই,—বরং অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে!

জননীকে ঝোলামধ্যস্থ অগ্নিখণ্ড দেখাইয়া জননী পুত্রে তৎসম্বন্ধে কিয়ৎক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন। ঝোলা পুনরায় পূর্ব্বস্থানে স্থাপিত হইল। সোণার কোদাল ও সোণার দা লইয়া দেবনাথ ও তাঁহার জননী উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

মুদ্রাবিনিময়।

সভ্য দেশ মাত্রে দ্রব্য সকল ক্রয় বিক্রয়ার্থ এখন প্রায় মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চর্ম্ম বা কাগজ নির্ম্মিত মুদ্রা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহা

টাকা, পয়সা বা নোট নামে আখ্যাত। মুদ্রা ব্যবহারের, প্রধান লাভ এই যে ইহা অধিক মূল্যের ও স্বল্পাকারে অনায়াসে যেখানে ইচ্ছা সঙ্গে ২ লইয়া যাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ যে কোনও আবশ্যক দ্রব্য যে কোনও পরিমাণে প্রয়োজন হয় ইহাদ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে। তৃতীয়তঃ ইহা মূল্যের একটী সাধারণ মাপকাটি, ইহা দ্বারা দ্রব্য সকলের মূল্যের ঠিক্ তুলনা হয়। মুদ্রার ব্যবহার কিন্তু সর্ব্বকালে ছিল না এবং এখনও অনেক দেশে ইহার ব্যবহার অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত। মানব প্রথম প্রথম বিনিময় প্রথা দ্বারাই দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় সম্পাদন করিত অর্থাৎ এক জনের ঘরে চাউল আছে, বস্ত্রের প্রয়োজন। যাহার ঘরে আবার অতিরিক্ত বস্ত্র আছে, কিন্তু চাউলের অভাব, প্রথোমক্ত ব্যক্তি তাহার নিকট জিনিষ বদলাইয়া আনিত। বাজার হাটে যাহার যাহা অতিরিক্ত থাকিত, তাহা বহিয়া লইয়া যাইত এবং তৎপরিবর্ত্তে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই লইয়া আসিত। এরূপ কারবারে যে কত অসুবিধা, তাহা সহজেই বুঝা যায়। একত কোথায় কাহার প্রয়োজন হইবে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া তাহার নিকট তাহার প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত করা কঠিন ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ অনেক ভার বহিয়া লইয়া গিয়া কিছু বিনিময় করিয়া অবশিষ্ট ফিরাইয়া আনিতে হয়। আর কাপড়, বাক্স বা ঘড়া ঘটীর কতক অংশ দিয়া তাহার তুল্য মূল্য অন্য বস্তুর কতক অংশ লওয়া অনেক সময় বিড়ম্বনা সার হয়। ইহার ফল এই হয় যে অনেক সময় অল্পমূল্যের বস্তুর জন্য অধিক মূল্যের বস্তু ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতে হয়।

যাহা হউক মুদ্রার পরিবর্ত্তে ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও জাতি মধ্যে যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয়, তাহার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

নরওয়ে দেশে মুদ্রার পরিবর্ত্তে শস্য ব্যবহার হইয়া থাকে।

আদিমকালে পশুচর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে মুদ্রা-রূপে ব্যবহৃত হইত।

ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে চার রুটী এবং চীন দেশে রেশম টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন রোমকদিগের নিকট ভেড়া এবং বলদ সকল মুদ্রা স্থানীয় ছিল।

জুলু এবং কাফ্রি জাতির মধ্যে বলদ সকল মুদ্রার ন্যায় হস্তান্তরিত হয়।

রুষিয়ার নিজনি নভোগরড্ প্রদেশে দস্তা আজও মুদ্রা রূপে চলে।

নবগিনির মফঃস্বল স্থানে ক্রীত দাসী সকল মুদ্রাস্থানীয়।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন ফলের বীজ মুদ্রা রূপে প্রচলিত।

দক্ষিণ আমেরিকার অভ্যন্তরস্থ প্রদেশ সকলে নারিকেল, ও ডিম্ব প্রভৃতি মুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিত। মধ্য আফ্রিকার কোন কোন স্থানে ছুরি, বড়্সার মাথা, পিতলের সূতা প্রভৃতি মুদ্রাস্থানীয়। গ্রীস দেশে

একতাল ধাতু মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, তাহার উপরে মূল্য পরিমাণ অঙ্কিত থাকিত।

এডাম স্মিথ বলেন "অধিক দিনের কথা নহে, স্কটলণ্ডে পেরেক মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।"

ফিজিদ্বীপবাসীরা তিমির দন্ত, দক্ষিণ-সাগর দ্বীপবাসীরা লাল পালক এবং এবেসিনিয়াবাসীরা লবণ মুদ্রারূপে ব্যবহার করে। আইসলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের প্রাচীন আইন পাঠ করিলে দেখা যায়, তথায় গো মেষাদি মুদ্রাস্থানীয় ছিল।

টিউটনিক জাতীয়েরাও প্রাচীন কালে জরিমানা স্থলে গোমেষ প্রদান করিত।

১৬৫২ সালে আমেরিকার উপনিবেশে, তমাক, সোলা ও কড়মৎস্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষীয় দ্বীপসমূহ এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত।

কার্থেজিনিয়েরা বাণিজ্যের উন্নতি সহ ধাতুমুদ্রা ব্যবহার করিত।

১১৫৮ খৃষ্টাব্দে বারবারোসা নরপতি মিলনের সহিত যুদ্ধের সময় চামড়ার টাকা চালান।

ফ্রান্সরাজ সাধু জনও ১৩৬০ সালে ইহাঁর অনুকরণ করেন। বৃটিশাধিকৃত ওয়েষ্টইণ্ডিস দ্বীপে আল্পিন, একটুকরা রুটী অথবা এক চিম্‌টা নস্য দিয়া জিনিষ কেনা যায়।

আফ্রিকার উপকূলে কুড়ালি মুদ্রারূপে গ্রহণ করিতে কোনও আপত্তি নাই। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার উপনিবেশী-দিগের মধ্যে বন্দুকের গুলি এক ফার্দ্দিং হইতে এক শিলিং পর্য্যন্ত মূল্যে গৃহীত হইত।

উদাসীনের চিন্তা।

সরোজিনী একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া এক বিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা কার্য্য করিতেছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়ন কার্য্য শেষ করেন নাই—নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়নে অবসর সময় অতিবাহিত করিয়া থাকেন। বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা করিতেও ভাল বাসেন। বিশেষ ভাবে ডার্ব্বিন এবং তাঁহারই অনুবর্ত্তী লেখকদিগের গ্রন্থের বড় আদর করেন। তাঁহার একজন সহাধ্যায়িনী তাঁহার ন্যায় উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত না হইলেও উচ্চশিক্ষার চর্চ্চা করিতে ভাল বাসেন। ইনিও সর্ব্বদা সরোজিনীর সহিত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে প্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। এক সময়ে উভয়ে কার্য্যস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পর্য্যটনে বহির্গত হন। ভারতের নানা

তীর্থ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন কামনাই তাঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া নানা স্থান পর্য্যটনের পর এক তীর্থে উপনীত হইলেন। তীর্থের কোন এক পাণ্ডার সাহায্যে দর্শনযোগ্য অনেক স্থান দেখিলেন। অবশেষে এক পাহাড়ে উপনীত হইলেন। তথায় পাণ্ডা এক খণ্ড প্রস্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিল "মা। ঐ দেখুন সীতা দেবীর হস্ত। সীতা দেবী এস্থলে রাবণকে ভিক্ষা দিবার জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন, সেই হাত পাথর হয়ে এখনও রয়েছে।" সরোজিনী কিংবা তাঁহার সহচরী পাণ্ডার একথা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু দেখিলেন প্রস্তর-নির্ম্মিত হস্তখানি অনেক পরিমাণে মানবের হস্তেরই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা প্রথম দৃষ্টিতে মনে করিয়াছিলেন যে উহা মানবেরই হস্ত-নির্ম্মিত—কোনও ব্যক্তি অন্ধ বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস গাঢ়তর করিবার জন্য ওরূপ চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়াছে। পরে অগ্রসর হইয়া বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া স্থির করিলেন যে তাঁহাদের প্রথম সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। উহা কোনও মানুষের হস্ত-রচিত নহে, স্বাভাবিক শক্তিতেই ওরূপ হস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। মনে করিলেন যে বর্ষার জলধারা হয়ত প্রস্তরের উপর বৎসর বৎসর পড়িতে পড়িতে কতক অংশ ক্ষয় করিয়া ঐরূপ হস্ত নির্ম্মাণের সহায়তা করিয়াছে। এই সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু উভয়েরই মনে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া উভয়ে যখন উপবেশন করিলেন, তখন এই বিষয়েরই প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। সরোজিনী তাঁহার সহচরী মানময়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভাই মান! আজ আমার মনের বহুদিনের একটা খট্‌কা ভেঙ্গে গেল।"

মান—ভাই সে খট্‌কাটা কি?

সরোজিনী—ডার্ব্বিনের সেই প্রাকৃতিক মনোনয়নের (Natural selection) বিষয়টা আমি অনেক দিন ধরে চিন্তা কচ্ছিলেম, কিন্তু কিছুতেই ওর ঠিক্ মীমাংসা করে উঠ্‌তে পারি নাই। আজ ঐ হাতখানি দেখে আমার সব সন্দেহের মীমাংসা হয়ে গেল।"

মান—বিষয়টা কি এতই সহজ যে তুমি হঠাৎ মীমাংসা করে ফেল্লে? ডার্ব্বিনের মত পণ্ডিত লোক যার পিছনে এত মাথা ঘুরিতেছে! তুমি তার ভুলের এত সহজেই মীমাংসা কল্লে! আচ্ছা মীমাংসাটা কি, একবার শুনি না।

সরোজিনী—আমি তাঁর বই পড়ে ভাবছিলেম যে প্রকৃতি বলেত কোন জিনিস নেই, তবে তার আবার একটা মনোনয়ন কি? মন থাক্‌লে না মনোনয়ন? প্রকৃতি কি এক ব্যক্তি যে তার আবার একটা মন থাক্‌বে, আর মনোনয়ন হবে? আজ তার মীমাংসা পেলেম। প্রাকৃতিক শক্তিতে কাজ হয়, অথচ তাহা যেন মনোনীত কার্য্য ব'লে বোধ হয়। যেমন এই হাত

খানি, কোন মানুষ ইহা গড়ে তোলে নাই, অথচ মানুষের গড়া হাতের মত বোধ হয়। উহা প্রাকৃতিক শক্তিরই ক্রিয়া।

মান—বেশত বুঝেছ, ডার্বিন কি কথা বলেছেন? ডার্বিন বোধ হয় বলেছেন যে কখন কোন স্বাভাবিক কারণে কোনও জন্তুর, অঙ্গের যদি সামান্য পরিবর্ত্তন হয় এবং সে পরিবর্ত্তন, যদি জন্তুর উপকারজনক হয়, তা হলে সে পরিবর্ত্তিত অঙ্গ তিরোহিত না হয়ে বংশপরম্পরায় রক্ষিত হতে থাকে; এবং কালে উহা পরিস্ফুট অবস্থায় পরিণত হয়ে সেই জাতীয় জন্তুর উপকার কর্ত্তে থাকে। পক্ষান্তরে যে অঙ্গ অসুবিধাজনক কিংবা অপকারী, তাহা ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হয়। ঐ হাত খানির ভাব কি সেরূপ?

সরোজিনী—নয় কেন? হাত খানিও হয়ত একদিনে গড়ে উঠে নাই; ঐরূপ গঠিত হতে হয়ত শত শত বৎসর চলে গিয়েছে। আজ একটু—কাল একটু এরূপ করে কত বৎসর যে চলে গিয়েছে, তার কি কিছু ইয়ত্তা আছে? কোনও জন্তুর হলে হয়ত এতেই কত বংশ পার হয়ে যেত!

মান—ঘটনাত কেবল সময়ের নয়। এর ভিতর আর একটু খট্‌কা আছে, তা কি তলিয়ে দেখেছ?

সরোজিনী—কি? ভেঙ্গেই বলনা কেন?

মান—হাতখানির সঙ্গে কোন ব্যক্তির কিংবা জাতির উপকার অপকারের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সরোজিনী—বেশত বলছ, ওখানে যে পাণ্ডা রয়েছে, সে হাত দেখিয়ে ঢের পয়সা উপার্জ্জন কচ্ছে, তবে উপকারের সম্বন্ধ নাই কি করে? এর দ্বারা পাণ্ডার বংশপরম্পরার উপকার হবে।

মান—তুমি এত বড় মোটা কথাটা বুঝতে পার না? কি অলীক যুক্তি কচ্ছ। এই যে পাণ্ডা উপকার পাচ্ছে, তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। এই হস্তখানি যদি নিবিড় বনে গড়ে উঠত, তাহলে কেহ ইহা দেখতে পেত না' আর সীতাদেবীর ইতিহাসটা যদি না থাকৃত, এবং লোক সকল যদি সীতাদেবীর ইতিহাসটাকে দেবলীলা বলে এত আদর না কত্ত, তাহলে কেহ কি পয়সা দিত?

সরোজিনী—আমরা পয়সা দিলুম কেন? আমরা কি আর দেবলীলায় বিশ্বাস করে দিয়েছি?

মান—তোমার সঙ্গে যুক্তি করা বিড়ম্বনা। দেবলীলা বলে বিশ্বাস করি নাই, কিন্তু হিমালয়ের অগম্য স্থলে যে এরূপ হাত নাই তার প্রমাণ কি? তা কি কেও দেখতে পায়, না তা কোনও পাণ্ডার উপার্জ্জনের পথ হয়েছে? এর দশাও ঐরূপ হতে পার্ত্ত। এই হস্ত এবং পাণ্ডার অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে কোনও স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। উহা সম্পূর্ণ আকস্মিক ব্যাপার। কিন্তু ডার্বিনের মত তা নয়। পরিবর্ত্তিত অঙ্গ এবং

উহার সহিত জন্তুর উপকার অনুপকারের দুশ্চেদ্য সম্বন্ধ। উপকারপ্রদ অঙ্গ থাকবে এবং অনিষ্টকারী অঙ্গ লোপ পাবে, ইহাও স্থির নিশ্চিত; এজন্যই প্রশ্নটী দুরূহ।

সরোজিনী—প্রশ্নটি এতেই বা দুরূহ বলি কেন?

মান—প্রকৃতির কি উপকার অনুপকার বোধ আছে? অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইল, প্রাকৃতিক শক্তিতে দুই খানি জীর্ণ বাড়ী পড়ে গিয়ে কতকগুলি লোক মারা গেল। প্রকৃতি উপকার খুঁজিল কই? প্রাকৃতিক নিয়ম এই দেখি যে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ হতে পরবর্ত্তী কার্য্যের উৎপত্তি হয়। বর্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, জীর্ণ বাড়ীর ইষ্টকগুলির যোগাকর্ষণের শিথিলতা তাহার ফল। তৎপরে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ, ইষ্টকাদির ভূমিতে পতন তাহার ফল। এইরূপ প্রাকৃতিক শক্তিতে কোনও জন্তুর এক অঙ্গের পরিবর্ত্তন হতে পারে এবং সেইটি কারণ হলে ফল স্বরূপ একটি কার্য্য হতে পারে। কিন্তু সেই কার্য্যটি যে জন্তুর উপকারজনক, ইহা কি অন্ধ প্রকৃতি স্থির করে দিতে পারে? এবং উপকারজনক হলেই যে সে অঙ্গ সে কাজে সর্ব্বদা ব্যবহার কর্ত্তে হবে, ইহাও কি অন্ধ প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তে পারে? ইহার মূলে বুদ্ধিই কার্য্য করে, স্বীকার কর্ত্তে হবে। মনে কর কোনও জন্তুর কর্ণ লম্বমান। সে বনের কোন বলবান্ জন্তুর ভয়ে ভীত, তাই সে বলবান্ জন্তুর স্বর শুনতে পেলেই কর্ণকে সে দিকে প্রসারিত কর্ত্তে চেষ্টা করে; পৌনঃপুনিক এবম্বিধ চেষ্টার ফল স্বরূপ লম্বমান কর্ণ উৎপন্ন হতে থাকে। যে জন্তুর বুদ্ধি নাই, সে তাহা অপেক্ষা বলবান্ জন্তুর অনুমান কর্ত্তে পারে না। তৎপরে সে স্বরের তারতম্য করিতেও অক্ষম হইবে। প্রাকৃতিক শক্তি বলেই স্বরের তারতম্য হইবে এবং এক জন্তু অন্য জন্তু অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হইবে ইহা স্বীকার করা যেতে পারে না। আত্মরক্ষা করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক স্বীকার করিলেও উক্ত দুই প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া প্রয়োজনীয়। কিন্তু পণ্ডিতদিগের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক কি বুদ্ধিগত, তদ্বিষয়েও মতভেদ দেখা যায়। কোনও ক্রিয়া প্রথমতঃ বুদ্ধিগত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহা এত অভ্যস্ত হয় যে উহা স্বাভাবিক বলিয়াই অনুমিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদিগের চক্ষুর পলক ধরা যাইতে পারে। শিশুর চক্ষুর পলক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পরে চক্ষু রক্ষা করিবার জন্য ঘন ঘন পলক ফেলিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে উহা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিও প্রথমতঃ একরূপ বুদ্ধিগত ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। কারণ আত্মরক্ষা কথাটার মধ্যে তিনটি বিচার্য্য বিষয় আছে:—আত্ম, কোন্ কারণে আত্মরক্ষা এবং কোন্ কারণে আত্ম বিনাশ হয় এতদ্বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়।

সরোজিনী—কেন, জ্ঞান না থাকলে কি হয় না? কোন কোন লতা আছে, তাহাকে ছায়ায় রেখে দিলে উহা রোদের দিকে অগ্রসর হয়। এ যে আত্মরক্ষার ভাব, ইহা কি বুদ্ধিগত না স্বভাবজ?

মান—এবিষয়ের জবাব দেওয়া মুস্কিল। যদি লতা হতে পার্ত্তেম এবং সে জ্ঞান লয়ে আবার মানুষ হতেম, তাহলে বলতে পার্‌তম।

সরোজিনী—ঠেকিলেই তোমার কুতর্ক! আচ্ছা শিশু যখন খিদে পেলে কাঁদে, তখন তার ওরূপ কান্না কি স্বাভাবিক নয়?

মান—না, আমার তা মনে হয় না, শিশুর প্রথম কান্না স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু যখন কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাঁদে, তখন স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ভাব থেকে নয়। উহা বুদ্ধিগত, কিন্তু সে বুদ্ধির কার্য্য এত অস্পষ্ট যে শিশুর তাহা মনে থাকে না।

সরোজিনী—তুমি উপরে যে কতর দৃষ্টান্তটি দেখালে, তাহা বুদ্ধির কার্য্য মানিয়া লইলেও ডার্ব্বিনের মতের কি কোন দোষ হয়?

মান—হাঁ উহা মানিয়া লইলে বুদ্ধির কারণের কারণ আদিকারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে হয়, এরূপ কর্ত্তে কর্ত্তে জ্ঞানময় ঈশ্বরের সত্তা না মানিয়া থাকা যায় না। এ বিষয়ে অনেক সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম কথা আছে, পরে সুবিধা মতে তোমায় বুঝাব।

প্রভাতী।

নবম পরিচ্ছেদ।

এক দিন রজনী দ্বিপ্রহরে প্রভাতী বৃদ্ধা ঝিকে ডাকিয়া কহিল "তুই আমাকে মার মত মানুষ করিয়াছিস্। আজ আমি তোকে সুনীল ও বিভাতীকে দিয়া গেলাম, যদি কখনও ফিরিয়া আসি, তবে আমাকে ফিরাইয়া দিস, নচেৎ তুই ইহাদের মায়ের কাজ করিস!"

মুমুর্ষু উষায় নলিনী-দলগত শিশির-বিন্দু যেমন রবিতাপে শুখাইয়া যায়, তেমনি প্রভাতী প্রখর জ্ঞানে ও কঠোর প্রতিজ্ঞার দ্বারা উথলিত অশ্রুজল সম্বরণ করিয়া বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইল। বৃদ্ধা প্রভাতীর পবিত্র মনোভাব এবং জলন্ত প্রতিজ্ঞার কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাত ছিল, অতএব বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া অজস্র অশ্রুজলে বালক বালিকার মস্তক সিক্ত করিতে লাগিল। প্রভাতী স্বামীকে শয্যা হইতে উঠাইয়া কহিল "তুমি নদী-তীরে গিয়া আমার অপেক্ষা কর, আমি আসি।" এই বলিয়া সে মধুমতীর নিকট গেল। প্রভাতীর মতানুসারে মধুমতী কটকের দরজা রাত্রি দুপ্রহর পর্য্যন্ত মুক্ত রাখিয়াছিল। প্রভাতী একবারে মধুমতীর

শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত। মধুমতী শয্যার উপরে ছট্ ফট্ করিতেছিল। প্রভাতীকে দেখিয়া উঠিল। প্রভাতী কহিল আমার সঙ্গে আইস। মধুমতী প্রভাতীর সঙ্গে সঙ্গে ফটকের দরজা পার হইয়া চলিল এবং ক্ষণকাল পরে কহিল "পোড়ামুখী! তুই কোথায় যাইতেছিস্।"

প্রভাতী—"চুপ কর্। আমার সঙ্গে সঙ্গে আয়।" কতকক্ষণ চলিয়া মধুমতী দেখিল প্রভাতী নদীর তীরাভিমুখে যাইতেছে। তখন সে কহিল "প্রভাতী! দেখ আমি আর চলিতে পারি না। আমার পা আর উঠিতেছে না। আমি কখনও ফটকের বাহির হই নাই। তুই বল্ তুই আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস?" প্রভাতীর মনোভাব মধুমতী পূর্ব্বেই অনেকটা বুঝিয়াছিল। সে চিরকাল ঈশ্বরের নিকট নির্দোষ থাকিয়া অতি পবিত্র ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে এই তাহার ইচ্ছা। দোষের কাজ অন্যায় কাজ সে কখনও করিবে না এই তাহার অলঙ্ঘ প্রতিজ্ঞা। সে অনিলকে ভালবাসে একথা সত্য, কিন্তু ভালবাসা একটা দোষের কাজ বলিয়া সে মনে করে না। পাইবার আশা এবং পাইতে চেষ্টা করাই দোষের কাজ বলিয়া মনে করে। অতএব সে প্রভাতীর সঙ্গে আজ যাইতে ভয় পাইতেছে। সে অনিলকে ভালবাসে। এ ভালবাসা নদীর সাগরের প্রতি ভালবাসার মত নয়; কুসুম যেমন নক্ষত্রকে ভালবাসে, তদ্রূপ সে অনিলকে ভালবাসে। সে অনিলকে ভালবাসিয়াই সুখী, অনিলকে দেখিয়াই সুখী, অনিলের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই সুখী এবং অনিল যে দেশে, যে রাজ্যে থাকে, সে সেই দেশে সেই রাজ্যে থাকিয়াই সুখী। সে ভাবে প্রভাতী এক রকম তপস্যা করিয়াছিল, আমি অন্য রকম তপস্যা করিয়াছি। প্রভাতী অনিলের পাদস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়, আমি অনিলের চরণ চিন্তা করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করি।

প্রভাতী মধুমতীর হৃদয়ের হৃদয়, মধুমতী হৃদয়কে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করে না। প্রভাতীর নিকট হইতে সে প্রভাতীর হৃদয়-রত্নকে কাড়িয়া লইতে চাহে না। তবে কিনা সে প্রভাতীর স্বামীকে ভালবাসে, সে কথা সত্য। কিন্তু সে ভাবে সৌন্দর্য্য ও সদ্‌গুণকে কে না ভালবাসে? দেবতাকে কে না পূজা করে? অনিলও দেবতা, তাঁহাকে কি প্রভাতী একা পূজা করিবে? মধুমতী ত নিষ্কাম হইয়া দেবতা পূজা করিতেছে মাত্র, তাহাতে আবার দোষ কি?

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মধুমতী প্রভাতীর স্বামীকে ভালবাসিয়া অপরাধী, মধুমতী ঈশ্বরের নিকট—জগতের নিকট—প্রভাতীর নিকট অপরাধীর ন্যায় ভয়ে ভয়ে থাকে।

মধুমতী অনিলকে মনে মনে ভালবাসে, কিন্তু প্রকাশ্যে সে সে ভালবাসার কোনও পরিচয় দেয় না। এক দিন সে একটি

মাত্র অন্যায় কাজ করিয়াছিল। সে এক দিন অনিলের একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি আঁকিয়া হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন সে দেখিল প্রভাতীর স্বামীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ও হৃদয়ে ধরিয়া দারুণ অন্যায় কাজ করিয়াছে ও যখন সে দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল বিচারপতি ভগবান্ লোহিতলোচনে তাহাকে ভৎর্সনা করিতেছেন, তখন সে পাপ-ভয়ে ভীত হইয়া প্রভাতীর স্বামীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভাতীর নিকট ফিরাইয়া দিয়াছিল। তাহার চিরজীবন এইভাবে কাটিয়া যাইবে, এই তাহার মনের বিশ্বাস। কিন্তু আজ প্রভাতী আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনার হৃদয়-রত্ন তাহাকে দান করিতে যাইতেছে। মধুমতী ভাবিল, প্রভাতী নর-জগতের দেবতা। সে আপনার হৃদয়রত্ন আমাকে দান করিতেছে, আর আমি তাহাতে সুখী হইতেছি, কি অসম্ভব। প্রভাতী কমলাসনা লক্ষী, আমি তাহার চরণস্থিত পদ্মদলের কীটাণুকীট বিশেষ। কিন্তু আমি তাহা কিছুতেই হইতে দিব না। এই ভাবিয়া মধুমতী প্রভাতীকে কহিল "তুই আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছিস্? আমি যাইব না, কিছুতেই যাইব না।"

"চুপ কর, গোল করিও না। আমি তোমাকে বিবাহ দিবার জন্য লইয়া যাইতেছি।" মধুমতী মনকে যতই ঠিক্ করুক না কেন, মানব-প্রকৃতি তাহাকে এখনও ছাড়ে নাই, বিবাহের কথা শুনিয়া তাহার সমস্ত শরীর যুগপৎ হর্ষোল্লাসে শিহরিয়া উঠিল, সেখানে তাহার অনিচ্ছা হইতে ইচ্ছার প্রাধান্যই বেশী হইয়া উঠিল। প্রথম বিবাহের কথা শুনিয়া কোন্ নবযুবতীর হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চার না হয়। ভয় দুঃখও যে তাহার মনে উদয় হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু প্রবল সুখাতিশয্যে মনের সে ভাবগুলি ম্রিয়মাণ হইয়াছে। সে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া প্রভাতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

মকরন্দ গন্ধ পরিপূর্ণ চপল মধুকর-সমন্বিত সরোজসমূহে অলঙ্কৃত একটী সরোবরের বিস্তীর্ণ তটভূমি অতিক্রম করিয়া অতি প্রত্যূষে মধুমতীর হাত ধরিয়া প্রভাতী এবং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনিল অতি দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই নীরব, সকলের মুখেই গভীর বিষাদ রেখা অঙ্কিত। তাহাদের কাহারও মধ্যে যেন আপনার বল নাই। কোনও দেববলে যেন তাহারা চালিত হইতেছে।

এইরূপ অনেক পথ চলিয়া তাহারা এক বৃহৎ প্রান্তরে গিয়া উপনীত হইল এবং সেই প্রান্তরে অনেকক্ষণ হাঁটিয়া একটী নিবিড় বনের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই বনের গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে এক অত্যুচ্চকায় ধবল গিরি দণ্ডায়মান ছিল। সেই পর্ব্বতের নিকট পঁহুছিতে তাহাদের ঠিক্ মধ্যাহ্ন সময় অতীত হইল। মধ্যাহ্নকালে সেই বনের

শোভা অতি রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গভীর বনস্থলী যেন আকুল কেশপাশ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রখর সূর্য্য-কিরণে অভিতপ্ত হইয়া নাসিকা-ধ্বনি করিতে করিতে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিতা। সেই উচ্চ গিরিবরের নিম্নদেশ পরিবেষ্টন করিয়া ফুলভারে নতাঙ্গী ফুলতরু স্তরে স্তরে নিচয় শোভা পাইতেছে। বনের চারিদিকে কাঠঠোক্‌রার একঘেয়ে আওয়াজ ও নানাবিধ পক্ষীর সুকণ্ঠের সহিত কালো কোকিলের মধুর ঝংকার উত্থিত হইতেছে, কোনওদিকে জন মানবের সমাগম নাই। তাহারা কোনও দিকে লক্ষ্য না করিয়া অনন্যমনে অতি দ্রুতপদে সেই উচ্চ পর্ব্বতারোহণে ব্যস্ত রহিল।

কিন্তু তাহারা পর্ব্বত পথ চলিতে চির অনভ্যস্ত, অতএব পর্ব্বতের উপর পঁহুছিতে তাহাদের ৫।৬ ঘণ্টা লাগিল। যখন তাহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে গিয়া পঁহুছিল, তখন বৈশাখের নীল সন্ধ্যা পর্য্যুষিত পুষ্পমাল্য হৃদয় হইতে অপনীত করিয়া মনোহর নবফুলে দেহ সজ্জিত করিতে করিতে সমস্ত জগৎকে কোলে করিয়া বসিল। পর্ব্বতের অধিত্যকা অতি সুন্দর—অতি পবিত্র। সে স্থল হইতে নিম্নদেশে নানাবিধ পুষ্পিত বৃক্ষে শোভিত প্রমোদিত বিহঙ্গকুলের নিনাদ, দ্বারা আকুলিত স্থাণুময় শৈলের রাশি বিস্তারিত। শিলাতল হইতে উন্নত গিরিশৃঙ্গ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। চারিদিকে অত্যুৎকৃষ্ট হেম কান্তিবিশিষ্ট পুষ্পবর্ষী চম্পক-বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। পর্ব্বতের উপরে বহুদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমি, তাহার এক পার্শে একটী ক্ষুদ্র স্বর্ণ মন্দিরে একখানি ক্ষুদ্র ভগবতী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছে, তাহার নাম "বরালিকা"। মন্দিরের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে সুন্দর কুসুমারণ্য ফুলভার মস্তকে বহন করিতেছে। সম্মুখ দিয়া সজ্জনের মোক্ষের প্রতিভূস্বরূপা গঙ্গা নদী বিশুদ্ধ বায়ুহিল্লোলে কুল কুল করিয়া বহিতেছে। পিয়াল তরু মঞ্জরীর পরাগ-কণায় শোভান্বিত হইয়া মধুকর সকল চারিদিকে নৃত্য করিতেছে।

ক্ষুদ্র তৃণ যেমন নদীর স্রোতে অনিবার গতিতে ছুটিয়া যায়, কোনও প্রতিবন্ধক পাইলেই হঠাৎ দণ্ডায়মান হয়; সেইরূপ প্রভাতী, অনিল ও মধুমতী মানবত্রয় চিন্তার স্রোতে অবিরাম গতিতে ছুটিতে ছুটিতে গন্তব্য পথের প্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

এক সময় কতকগুলি বিদেশী লোক অনিলকে বিনা অপরাধে চোর অপবাদ দিয়া আদালতে উপস্থিত করে এবং কোন সাক্ষি-বল না থাকায় অনিলের কারাদণ্ডের হুকুম হয়। কারাগারে গিয়া অনিল একজন সাধু বৃদ্ধ সন্ন্যাসী-বন্ধু প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনিল তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার সহিত কারাগার হইতে পলায়ন করে ও এই পর্ব্বতোপরি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া

বাস করে। এখানে সন্ন্যাসীর দীক্ষা-গুরু বাস করিতেন। তিনি অনিলকে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তৎকালে প্রভাতীর রূপে অনিলের মন মুগ্ধ ছিল, সে সন্ন্যাসীর কথা অমান্য করিয়া সংসার ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিল।

এই মনোরম পর্ব্বতোপরি অনিল প্রভাতীকে লইয়া আরও কতবার আসিয়াছিল। আজ আবার ঘটনা চক্রে পতিত হইয়া আপনার অজ্ঞাতসারে অনিল প্রভাতীর সঙ্গে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্বর্ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ গঙ্গাতীরস্থ এক উচ্চ ভূমিতে প্রকাণ্ড একখণ্ড কৃষ্ণ শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সায়ংকালীন ধ্যানে নিমগ্ন। মন্দ বায়ুভরে মৃদুকম্পিত ললিত পল্লব-শোভিত নব মাধবী লতার ন্যায় প্রভাতী প্রবালোপম অভিনব কর-পল্লব উত্তোলন করিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং অনিল ও মধুমতীর অগ্রবর্ত্তী হইয়া উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় তৎসমক্ষে স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

তপ্তকাঞ্চন তুল্য সুন্দর-কান্তি মহা-পুরুষকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেস্থলে সেই কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড প্রস্ফুরিত তড়িৎ-সমন্বিত শরৎকালের জলদ খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে জল-প্রপাতের মধুরধ্বনি, সম্মুখে "বরালিকার" সুপবিত্র স্বর্ণমন্দীর, ও ত্রিলোক-তারিণী গঙ্গার পাপহরা প্রেমসঙ্গীত।

এই সব পবিত্র শোভা অবলোকন করিয়া প্রভাতীর মানব প্রবৃত্তি সকল যেন একে একে দেবত্বে পরিণত হইতে লাগিল।

সেই অতি উচ্চ ও নির্জ্জনস্থানে আসিয়া প্রভাতী আপনার উপস্থিত সুখ দুঃখ সকলি ভুলিয়া গেল ও জগতের নিকট আপনাকে অতি ক্ষুদ্র দেখিতে লাগিল। তৎকালে অনিল ও মধুমতী নীরব-নিস্পন্দভাবে বিষয়ান্তর-জ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া মহাপুরুষের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। দুঃখ, সুখ, প্রেম, প্রণয়, পবিত্র, অপবিত্র, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তৎকালে তাহাদের মনে কোনও রকম ভাবের উদয় হইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সন্ন্যাসী সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া তাহাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহাদিগের শুষ্ক মুখ এবং ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সেই মহাপ্রাজ্ঞ মহাপুরুষ তাহাদিগের মনের ভাব সকলি বুঝিয়া লইলেন। ক্রমশঃ।

চতুরে চতুরে।

লাওয়ারেশের অর্থাৎ যাহার উত্তরাধিকারী নাই, তাহার সম্পত্তি রাজসরকারে যায়, ইহা প্রায় সর্ব্বদেশের রাজবিধি। হিন্দুরাজত্বেও এই নিয়ম ছিল। দিল্লীতে মোগল বাদসাহের রাজত্বকালেও এই প্রথার অতি বিচিত্র বিকট প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবিধি অনুসারে শুদ্ধ লাওয়ারেশের সম্পত্তি নহে—বাদসাহের বেতনভুক্ লোকমাত্র মরিলেই তাহার তাবৎ সম্পত্তি অবিলম্বে রাজ-সরকারে জমা হইত এবং বাদসাহ স্বয়ং তাহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতেন। এক মুহূর্ত্তে ধনীর বিধবাগণ, পুত্রকন্যাগণ এবং পরিবারবৃন্দ পথের ভিখারী হইত। কাল যে লক্ষপতির ভার্য্যা বা সন্তান ছিল, আজ তাহাকে সামান্য উদরান্নের জন্য রাজপ্রসাদ-প্রার্থী হইতে হইত। বাদসাহ অনুগ্রহ করিয়া যদি কিছু মাসহারা দিতেন, তাহা হইলেই তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, নচেৎ কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না। অনেক সময় এই কুপ্রথা হেতু আমীর ওমরাহের পুত্রকেও সামান্য সৈনিকের কার্য্য করিতে হইত।

অবশ্য, সকল বাদসাহ এরূপ অর্থলোলুপ ছিলেন না; নানা দোষ সত্ত্বেও আরংজেব এ প্রথার বিরোধী ছিলেন—এ প্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সাহজাহান এ বিষয়ে বড় লোভী ছিলেন—তাঁহার দারুণ অর্থতৃষ্ণাহেতু কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই।

এইরূপ সম্পত্তি গ্রহণ সম্বন্ধে লোভী সুচতুর সাহজাহানের সহিত দুই ব্যক্তির চতুরতার কথা বর্ণিয়ার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বলিব।

দিল্লীর রাজসভায় নেকনাম খাঁ এক বিখ্যাত ওমরাহ। তিনি বাদসাহ সরকারে ৪০।৫০ বৎসর নানাপ্রকার সম্রান্ত কাজ করিয়া প্রভূত সম্পত্তি সঞ্চয় করেন। নেকনাম খাঁ সাহজাহানের পরস্ব-লোলুপতা বড় ঘৃণা করিতেন। যখন নেকনাম সাংঘাতিক পীড়ায় অবসন্ন—তাঁহার শেষ অবস্থা উপস্থিত, তখন তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া গোপনে নিজের সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র স্ত্রীলোক ও সেনানীগণ মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। তার পর সিন্দুক ও পেটরাগুলি পুরাতন লৌহখণ্ড, অস্থি, ছিন্ন বিনামা, ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে তালা বন্ধ করিয়া মোহর আঁটিয়া দিলেন। মরিবার সময় বলিয়া গেলেন—"সম্রাট্ সাহজাহানের জন্য এই সব রহিল।"

নেকনাম খাঁর মৃত্যু হইলে সিন্দুকগুলি প্রকাশ্য সভায় নীত হইল। সাহজাহানের

হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। তখনই সভাস্থলে সিন্দুকগুলি খুলিবার আদেশ দিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে চক্ষু স্থির। ঘৃণা, লজ্জা ও ক্রোধে অবিলম্বে রাজসভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে বুঝিল "উপযুক্ত হইয়াছে।"

আর একটী ঘটনা এই। এক ধনী হিন্দু বণিক কুসীদ ব্যবহারে অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন, তদ্ব্যতীত সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যেও নিযুক্ত হইতেন, তাহাতেও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। মৃত্যুকালে বণিক্ অনেক অর্থ রাখিয়া যান, —প্রায় দুই লক্ষ টাকা। বণিকের একমাত্র পুত্র ছিল, পুত্র অসচ্চরিত্র। পিতার মৃত্যুর পর সে অর্থের জন্য মাতার সহিত অনেক বিবাদ করিল; কিন্তু সম্পত্তির ভাগ কিছুই পাইল না; বুদ্ধিমান্ বণিক তাহার স্ত্রীকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছিলেন। অবশেষে যুবক বিফলমনোরথ হইয়া একযুক্তি অবলম্বন করিল। সে যাইয়া সম্রাট্-সমীপে নিবেদন করিল যে, তাহার পিতা মধ্যে মধ্যে রাজ-সরকারে কার্য্য করিতেন, এবং মৃত্যুকালে প্রায় দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্ত বৃদ্ধা মাতার হস্তগত।

সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র সাহজাহান বৃদ্ধাকে প্রকাশ্য রাজসভায় আনাইয়া অনুমতি প্রচার করিলেন যে, মৃত বণিকের সম্পত্তি হইতে এক লক্ষ মুদ্রা অবিলম্বে রাজ-ভাণ্ডারে আসিবে, পঞ্চাশ সহস্র তাহার পুত্র পাইবে, আর অবশিষ্ট বৃদ্ধার থাকিবে। আদেশ প্রচার করিয়াই রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন—"বুড়ীকে জোর করিয়া রাজসভা হইতে তাড়াইয়া দাও।"

বৃদ্ধা বাদসাহের এ নিদারুণ অনুমতি ও পরুষ ব্যবহারে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইল। মনে মনে করিল—"আমিত গিয়াছি, এখন যাহা বলিবার তাহা বলিয়া লই, না হয় প্রাণদণ্ড হইবে।" রক্ষিগণ তাহাকে বলপূর্ব্বক বাহির করিয়া দিতেছিল। বৃদ্ধা উচ্চৈঃস্বরে বলিল যে, বাদসাহ-সমীপে তাঁহার স্বামীর সম্পত্তি সম্বন্ধে তাঁহার আরও কিছু গোপনীয় সংবাদ দিবার ইচ্ছা আছে। শুনিয়া সাহজাহান কহিলেন "তবে কি শুনিবার আছে, শুনা যাউক।"

বৃদ্ধা সবিনয়ে বলিল "হজরৎ সেলামৎ! জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন্। আপনি অতি সুবিচার করিয়াছেন। আমার পুত্র বিষয়ের উত্তরাধিকারী, সে যে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পাইবে, তাহা যুক্তিসঙ্গত; আর আমি মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, আমাকে দয়া করিয়া যাহা দিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু একটী বিষয়ে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইবে। আমার মৃত স্বামীর সহিত জাঁহাপনার কিরূপ শোণিত-সম্বন্ধ, যেহেতু রাজ-সরকারে এক লক্ষ টাকা আসিবে, তাহা আমি অবগত নহি; কৃপা করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।"

বাদসাহ বৃদ্ধার শ্লেষোক্তি বুঝিলেন;

বুদ্ধিরা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তখনি পুনরাদেশ করিলেন—"তোমার সম্পত্তি তোমার রহিল, আমি কিছুই লইব না, এখন তোমার পুত্র কিছুই পাইবে না, আমার পূর্ব্বাদেশ রহিত করিলাম।"

বৃদ্ধা সানন্দে গৃহে ফিরিয়া গেল, দুর্বৃত্ত যুবকের যে ক্ষোভের সীমা রহিল না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

জননী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, আমার পরম পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী উক্ত অতীত বৎসরের অতীত মাঘের শেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া ও ইহলোকের শোক, দুঃখ, জরা, মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতধামে অমৃতধামবাসিনী দেবীবৃন্দের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছেন। তিনি এই গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার চিরবিরহে আমাদের এই সুখের সংসার বিষাদ কালিমায় আচ্ছন্ন, ভগ্ন ও শূন্য ও তাঁহা বিহনে আজ আমরা অনাথ। মা আমার ইহজগতে দেবীপ্রকৃতিতে বিরাজ করিতেন। তাঁর সতীত্ব, পাতিব্রত্য, অনিন্দিত প্রেমপ্রতিভা, পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, দীনে দয়া, সরলতা, সুবিবেচনা, লজ্জাশীলতা, সন্তান-বাৎসল্য ও ভগবদ্‌ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ তাঁহাকে দেবীরূপে সাজাইয়া ইহলোকেই সেই স্বর্গরাজ্যের উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিল। তিনি ধন্যা, তাঁহার গর্ভে আমরা সঞ্জাত হইয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি। মা আমাদের সতীকুল-গৌরব। বিশ্বজননী তাঁহার সরল প্রাণে কি এক মধুরতা-পূর্ণ, ভাবের সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সেই পবিত্র প্রেমানন সন্দর্শন করিলে আমার মন প্রাণ আনন্দসিক্ত হইয়া উঠিত। মার আমার সেই পবিত্র সুকোমল মূর্ত্তিখানি আজও সমভাবে এ দীনের প্রাণে জাগিতেছে। পুণ্যবতী জননী যখন সেই বিশ্বারাধ্য বিশ্বপিতার ধ্যানধারণায় চিত্তকে সমাহিত করিতেন, তখন তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি কি অপূর্ব্ব পবিত্র ও শান্তভাব ধারণ করিত! সতী-জীবনের প্রভা ও মাধুর্য্য তাঁহার সরল প্রাণে সুন্দররূপে বিকশিত হইয়াছিল। সাধ্বী পতিব্রতাদিগের হৃদয়োদ্যানে সদ্‌গুণ-কুসুম-কলিকা যেমন স্বর্গীয় সৌরভে ভরিয়া প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, মার আমার প্রাণে সেই সকল অম্লান কুসুম-কলিকা প্রস্ফুটিত থাকিত। তিনি পবিত্রহৃদয়া, সদাচারবতী ও সকলের হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। পরসেবা তাঁহার জীবনের

প্রিয় নিত্য ব্রত ছিল। তিনি তাঁহার সমবয়স্কা পুরস্ত্রীদিগকে তাঁর পবিত্র জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট করিয়া, তাঁহাদিগকে সত্যের পথে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেন ও তাঁহাদের সুকোমল নারী-জীবনে পুণ্যের বিমল সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত দেখিতে ভালবাসিতেন। সতী-জীবনের যে একটী প্রধান ভূষণ পবিত্রতা, মা আমার সেই পবিত্রতার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন ও সদা স্বচ্ছ থাকিতেন। নরজগতের শোকতাপ যে স্থানকে স্পর্শ করিতে পারে না, যেখানে বিমল আনন্দের উৎস সদা উৎসারিত হইতেছে, প্রেম ভক্তির স্রোত যেখানে নিয়ত প্রবাহিত এবং যেখানে ভগবদ্ভক্ত দেবদেবীবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া সেই আনন্দময় অমৃতময় দেবতার আরাধনা করিতেছেন, যেখানে প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া পরলোকবাসী প্রেমিকগণ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিতেছেন, সেই অমর লোকে অমৃতময়ী বিশ্বজননীর ক্রোড়ে, যে ক্রোড় সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতি, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্য্য নারীগণের চির অধিকৃত, সেই পবিত্র প্রেম-ক্রোড়ে আমার পুণ্যবতী স্বর্গীয়া জননী বিরাজ করিতেছেন—ইহা স্মরণে মাতৃ বিয়োগ-জনিত অনাথ সন্তানের অবসন্ন প্রাণ উত্তেজিত ও পরিতৃপ্ত হয়। আহা! মা'র আমার সেই আনন্দভরা প্রেম-প্রতিমা যদি এ ভগ্ন গৃহে প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তাহা হইলে এ দীন সন্তান তাঁর পবিত্র জীবনের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া ও তাঁর সেই প্রেমপূর্ণ শান্ত মূর্ত্তিখানি দেখিয়া এ ভগ্ন ও রুগ্ন প্রাণে কত শান্তি প্রাপ্ত হইত! কিন্তু আবার মনে হয় মঙ্গলময়ী বিশ্বজননী তাঁর কোন নিগূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইহজগতের নানা বিপদ্ আপদ্ হইতে মুক্ত করিয়া ভালই করিয়াছেন। মার আমার স্বর্গারোহণের পর হইতে এ সংসারে কত শোক দুঃখের ঝড় বহিয়া গেল, মার সেই কোমল প্রাণে এ সকল দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করিতে হইল না, ইহাতেই মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, কত চলিয়া গেল—ফিরিয়া আসিল, কিন্তু মায় সেই প্রেমভরা মুখখানি আরত দেখিতে পাইতেছি না, তাঁর সেই হৃদয়-ভরা স্নেহ আরত উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। এ জগতে সে প্রেম সম্ভোগের আশা এককালে ফুরাইয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ হইতে আমরা বঞ্চিত নহি। মাতঃ! আমরা আপনার সেই আদরের পুত্র কন্যাগুলি—যাহাদিগের লালনপালনোদ্দেশে কত ত্যাগস্বীকার ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, যাহাদিগের মঙ্গলকামনায় অসহনীয় রোগ যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করিয়া মধুর মাতৃ-প্রেমের মহিমা দেখাইয়া গিয়াছেন, আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদে ও করুণারূপিণী বিশ্বজননীর অপার করুণায় কত দুর্ঘটনা অতিক্রম করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি। মা! তুমি যেমন আমাদিগকে তোমার

সুকোমল বাৎসল্য প্রেমের শীতল ছায়ায় রক্ষা করিয়া আমাদিগের সকল সন্তাপ বিদূরিত করিতে, সেইরূপ প্রেমময়ী বিশ্বমাতা তাঁহার অহেতুক প্রেমে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। জননি! প্রেমময়ী জগন্মাতার অতুল স্নেহপ্রভাবে আজও আপনার এ দীন সন্তানের ক্ষুদ্র জীবনটুকু সঞ্জীবিত রহিয়াছে। মাতঃ! অগ্রে আপনাকে স্নেহময়ী জননী বলিয়াই জানিতাম, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আপনি শুদ্ধ মায়াময়ী মা ছিলেন না, আপনি আমার দেবীরূপিণী জননী। স্বর্গীয় সাধুভাবে আপনি বিভূষিতা ছিলেন, আমরা দেবীর সন্তান, দেবীর গর্ভে আমাদের জন্ম, দেবীর পবিত্র শোণিতে আমাদের জীবন গঠিত ও দেবীর স্নেহে আমরা পালিত, তবে কেন না আমরা সেই দেবভাব লাভ করিব ও সেই দেব-ভূষণে বিভূষিত হইব? মাতঃ! আপনি এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। আপনি বিশ্বজননীর অনন্ত প্রেমের বিন্দুমাত্র প্রতিকৃতি। আপনার সেই সুধামাখা শান্তিপ্রদ বিমল মূর্ত্তি কখনও ভুলিতে পারিব না। আপনার সেই অমৃতময় কোমল করস্পর্শ, যাহা দ্বারা এ দীন সন্তানের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইত, সেই প্রেমহস্ত দুখানিও ভুলিতে পারিব না। আর মা, আপনার সেই সুন্দর পবিত্র চরণ দুখানি—যাহা স্মরণ করিয়া আমার মন প্রাণ শীতল হয়, তাহাও চির দিন এ প্রাণে আঁকিয়া রাখিব। আহা! মাতৃচরণ-ধূলি ভক্তির সহিত গ্রহণ করিলে সন্তানের প্রাণ পবিত্র হয় ও জননীর পবিত্র জীবনাদর্শে জীবন গঠিত হইলে মানব দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। জননি! আপনার প্রেমের ঋণ অপরি-শোধনীয়। মাতঃ! আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন এ দীন সন্তান আপনার উপযুক্ত সন্তান হইয়া আপনার পবিত্র জীবনের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয় ও যত দিন সন্তান জীবিত থাকিবে, যেন সেই প্রেমময়ী পরম মাতার চরণে মতি ভক্তি রাখিয়া তাঁহাতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁর পূজায় ও তাঁর সেবায় রত থাকিতে পারে।

মা জগজ্জননি! আমার স্নেহময়ী মাকে ইহলোক হইতে লইয়া গিয়াছ, তবে তুমি মা! আমার মা হ'য়ে নিকটে থাক। মাকে ডাকিলে মা কাছে আসেন, মার কাছে কাঁদিলে মা কোলে তুলে আদর করেন, রোগে শোকে পড়িলে মা বুকে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া মধুর বচনে সান্ত্বনা দেন। সেইরূপ মা বিশ্বজননী তুমিও সেই মায়ের মত হইয়া কাছে কাছে থাক, যখন মাতৃবিরহে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিবে, তখন তুমি তোমার সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী প্রেমমূর্ত্তি দেখাইয়া তোমার সেই সুকোমল পদ্মহস্ত দ্বারা আমার অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া তোমার শান্তি-ক্রোড়ে তুলিয়া লও এবং আমার সকল সন্তাপ বিদূরিত কর। মা! এ সংসারে নানা বিপদ আপদ রহিয়াছে,

যখন দুঃখ, যন্ত্রণা, প্রলোভন পরীক্ষা আসিবে, তখন দয়া করিয়া তোমার চরণাশ্রয়ে রাখিও, ও তোমার সেই প্রেমপূর্ণ মধুর বচন দ্বারা সান্ত্বনা দিও। জগজ্জননি! তুমি মাতৃহীনের জননী, তুমিই এ দীনের চির-নির্ভর, চির-ভরসা। অগ্রে যদি জানিতাম যে, আমার ইহ-জগতের জননী তাঁহার অভাব মোচনের নিমিত্ত তাঁর পরিবর্ত্তে এক অনন্ত স্নেহ-রূপিণী মাতৃসত্তা আমার সমক্ষে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে, সেই মাতৃবিয়োগ-কালে—দুদিনের মাতৃবিরহে আকুল প্রাণ হইয়া এত কাঁদিতাম না। বিশ্বজননি! তোমার অপার কৃপায় অনাথ সন্তানকে বুঝিতে দিয়াছ যে, যদিও কালকরভগ্ন ক্ষুদ্র মাতৃক্রোড় ও মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, কিন্তু মা তুমি তোমার অনন্ত প্রেমের ক্রোড় সকল সময় আমাদের জন্য পাতিয়া রাখিয়াছ। মা বিশ্বজননি! আমাদের পার্থিব জননীর আমরা চারিটী সন্তান, যেন চির দিন তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে তোমার স্নেহের ক্রোড়ে বসিয়া তোমার প্রেমাননের প্রতি তাকাইয়া থাকিতে পারি এবং ভক্তিভরে তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ও তোমার সেই প্রেমসুধা পান করিয়া নবজীবন লাভ করিতে পারি। বিশ্বমাতঃ! আমার সেই স্নেহময়ী মাকে তুমি তোমার স্নেহের ক্রোড়ে বসাইয়া অনন্তকাল অক্ষয় আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করিয়া রাখিও এবং দিন দিন তাঁর সেই পবিত্র আত্মাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিও, কাঙ্গালের এই একমাত্র প্রার্থনা।

মা! বহু দিন হল আজ গিয়াছ চলিয়া এ
প্রবাস ছাড়ি,
আনন্দে আনন্দময়ীর আনন্দ ভবনে।
জগতের মা তোমায় নিয়েছেন ডেকে
প্রসারি স্নেহের ক্রোড়,
কেন মা থাকিবে হেথা?
স্বরগের দেবী তুমি গিয়াছ স্বরগে।
আনন্দের ধামে সদা থাক মা আনন্দে সেথা।
আনন্দে পূজ মা নিত্য আনন্দময়ীরে,
আনন্দে রাখুন তোমা আনন্দরূপিণী।
চিরানন্দ সুধাপানে হয়ে পুলকিত
অনন্ত উন্নতি-পথে উঠ মা সতত,
তোমার আদর্শে করি জীবন গঠিত
মুক্তির সোপানে যেন উঠি অবিরত।
তব শুভাশীষ-বলে যেন মাগো অবহেলে
সংসার-সাগর হতে হই মা উদ্ধার।
চিরভক্তি চির প্রীতি থাকে যেন তোমা
প্রতি,
চির সুখ চির শান্তি দেও দগধ পরাণে।

* স্বর্গীয়া রাজ্ঞায়ণী ঘোষ বারুইপুরের নিকটস্থ কোনও পল্লীগ্রামের এক ধনীর একমাত্র কন্যা ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক ঈশ্বরনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য, অলৌকিক পাতিব্রত্য ও স্বামি-হিতৈষণা, সরলতা, সহৃদয়তা পরার্থপরতা ও পরসেবার অনেক দৃষ্টান্ত অনেক সময় দর্শন করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার চিরস্নগ্ন জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঈশ্বর ইঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন, ইঁহার জীবনে মাতৃজীবন হইতে যে দেবভাব আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা যেন চিরস্থায়ী হইয়া মাতৃস্মৃতি চির-জাগ্রত করিয়া রাখে। বা, বো, স।

গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।

সন্তান পালন।

সন্তানদিগকে বাধা করিতে হইলে, স্নেহ, প্রীতি ও শাসন মিশ্রিত ব্যবহার করিতে হইবে। শুধু তিরস্কার করিলে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে। শুধু ভয় করিয়া কার্য্য করিলে, তাহার কোনও সুফল ফলে না। অন্যায় করিবামাত্র রাগের উত্তেজনায় শিশুদিগকে শাস্তি দেওয়া অবিধেয়, কারণ তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করিলে ফলদায়ক হয় না।

স্বেচ্ছাচারিতা শিশুদিগের প্রধান দোষ। মঙ্গলময় বিধাতা শিশুগণের শারীরিক ও মানসিক মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত কতকগুলি বৃত্তি প্রবল করিয়া দিয়াছেন। প্রায় অনেক সময়ে বালক বালিকাগণ কুর্দ্দন ও ধাবন করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হয়। স্বাস্থ্যবান্ হইবার নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগের ঐ সকল বৃত্তি এরূপ প্রবল করিয়া দিয়াছেন। বিশেষ কোন অনিষ্টজনক কারণ না থাকিলে, তাহাদের ঐ সকল ইচ্ছাতে বাধা দিয়া, অসন্তুষ্ট করা নিতান্ত অন্যায়; কারণ ইহাতে তাহাদের সুখ ও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। যখন কোন বালক হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হয়, তখন তাহার সন্তোষের নিমিত্ত ভূমিতে পদাঘাত বা প্রতিহিংসাজনিত অপর কোন প্রকার আচরণ না করিয়া, শিশুর অসাবধানতা এবং পতিত হইবার কারণ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এতদ্দারা তাহাদের সতর্কতা বৃদ্ধি হয় ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় অভ্যাস হয়। আশৈশব যদি পিতা মাতা সন্তানদিগকে সুশিক্ষা দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করেন, তবে তাহারা কোন কালে পিতামাতার অবাধ্য হইতে পারে না। যাঁহাদের কৃপায় আমরা সুন্দররূপে লালিত পালিত হইয়া ভাবী জীবন সুখে কর্ত্তনের উপযোগী গুণাবলী প্রাপ্ত হই, যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া, নিয়ত আমাদের মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল, তাঁহাদিগকে কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে পূজা করা সন্তানের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ বৃদ্ধকালে অনেকে কিছু উগ্রস্বভাবান্বিত হইয়া থাকেন। জনক জননীর বৃদ্ধাবস্থায় ঐ উগ্রস্বভাবের জন্য ও অনর্থক তিরস্কারের নিমিত্ত শ্রদ্ধাবান্ সন্তানের বিরক্ত, বিচলিত বা বিষণ্ণ হওয়া অবিধেয়। যখন সন্তান জরাজীর্ণ পীড়িত জনক জননীর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, দিবানিশি সর্ব্বপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা উপেক্ষা করিয়া, আপনার সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন করিয়া, কেবল প্রফুল্ল অন্তরে তাঁহাদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন, তখনকার ন্যায় স্বর্গীয় সুখকর দৃশ্য জগতে আর নাই।

পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অনেক সময়ে জনক জননী অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু তজ্জন্য পিতামাতার প্রতি অবজ্ঞা ও অনাদর প্রকাশ করা কোন মতেই বিধেয় নয়।

অনেকে পিতামাতার প্রতি কিয়ৎপরিমাণে সদ্ব্যবহার করিয়াই মনে করেন যে, পিতামাতার ঋণ পরিশোধ করা হইল। কিন্তু ইহা সকলের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সন্তান চিরকাল সাধ্যানুসারে পিতামাতার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তাঁহাদের সেবা এবং সন্তোষ সাধন করিলেও পিতামাতার ঋণপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। কথিত আছে একদা জনৈক ব্যক্তি মাতার শ্মশানের উপর স্বর্ণমন্দির তৈয়ার করিয়া বলিয়াছিলেন, "মাতঃ! আমি অদ্যাবধি তোমার ঋণ-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিলাম।" এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্রই ঐ স্বর্ণমন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িল। ফলতঃ সন্তান শতবর্ষ কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিয়াও পিতামাতার ঋণ-পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তথাপি সাধ্যানুসারে জনক জননীর সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিয়াছি, এ বিষয় চিন্তা করিতে পারাও সৌভাগ্যের বিষয়। এ সংসারে কয়ব্যক্তি পিতামাতার মনে কোন প্রকার কষ্ট না দিয়া, সতত তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সাধ্যমত পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলে যে শুধু আত্ম-প্রসাদ লাভ হয়, তাহা নয়, এতদ্দ্বারা পিতামাতাও সুখী হন এবং আমরা পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম পালন করিয়া ধন্য হইতে পারি। যে শ্রদ্ধাভিষিক্ত ভক্তি-পরায়ণ সন্তান পিতামাতার প্রতি কোনরূপ অন্যায়াচরণ না করিয়া চিরদিন তাঁহাদের সুখ সাধনের জন্য মনঃপ্রাণের সহিত চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল পালন করিয়া সুখী হইবেন সন্দেহ নাই।

অর্গলের রাণী।

(গত প্রকাশিতের পর)

বিস্মিত মুসলমান সৈন্য তাহাদের বিপরীত দিকে ক্ষুদ্র এক দল মনুষ্যকে প্রবল বাত্যাপ্রবাহের মত আসিতে দেখিল—তাহাদের মাথার উপর প্রবলবেগে ঘূর্ণিত শাণিতাস্ত্র বিদ্যুদ্দীপ্তির মত বোধ হইতেছিল। মুসলমানগণ তখন আরও বিচলিত হইল, উত্তোলিত অস্ত্র হস্তে মার্ মার্ শব্দে ধাবিত হইল। কিন্তু তখনও সেই সহস্র মুসলমান সৈন্যের গতিশব্দ, অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও উত্তেজিত

জয়ধ্বনির ভীষণ কোলাহল মধ্যেও আর একটী অধিকতর উত্তেজিত সমবেত জয়ধ্বনি ধ্বনিত হইতেছিল,—"রাণীজীকি জয়।"

তখন নিমেষমধ্যে রাণী দেখিতে পাইলেন, কয়েকটীমাত্র অস্ত্রধারী তরুণ যুবক সিংহবিক্রমে তাঁহারই উদ্ধারের জন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়াছেন। সেই নির্ভীক যুবকদের দৃঢ়হস্তচালিত তরবারীর আঘাতে বিভ্রান্ত শত্রুসৈন্য তখন মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে শত্রুবেষ্টিত অসহায়া রাণী 'মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাণের উপায় মনে করিতে-ছিলেন, সহসা আশার আলো দেখিতে পাইলেন। ক্ষণেকের জন্যে তিনি ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু তখন আর ভাবিবার অবসর ছিল না, ততক্ষণে অর্গলের রাজ-অন্তঃপুরবাসিনীগণ দ্রুতগামী অশ্বে স্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহাদের চারি দিকে তেজস্বী, অস্ত্রাঘাত-নিপুণ হিন্দু যুবকদল অগণিত-শত্রুসেনা-প্রবাহ মধ্যে আপনাদের রক্তাক্ত তরবারীর সম্মুখে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অপ্রতিহতগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। এই অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহসিকতার অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্তনীয় ঘটনায় হিতাহিতবিমূঢ় বিশৃঙ্খল শত্রুসেনা সেই প্রবল বাত্যাতাড়িত অগ্নিরাশিতুল্য হিন্দু যোদ্ধাদলের ঘূর্ণিত অস্ত্রের সম্মুখে পড়িতেছিল ও মরিতেছিল। কিন্তু হইলে কি হইবে? তখনও উদ্ধারের আশা ছিল না। বীর হিন্দুদের বাহুতে বল ছিল, কিন্তু সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ বিপক্ষসেনা পার হইতে তাঁহাদের একবিন্দু জীবন্ত রক্ত অবশিষ্ট থাকিবে কি না সন্দেহ হইল,—তখন অগণিত হতাহত শত্রুসেনার সঙ্গে ক্রমে দুইটি চারিটি হিন্দুও সেই রক্তাক্ত ক্ষেত্রে প্রাণ আহুতি দিতেছিলেন। বিপক্ষের উন্মত্ত তরঙ্গায়িত সমুদ্র, তাহারি মধ্যে হিন্দু কয়-জন? মুষ্টিমেয়। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় হিন্দুসন্তান আজ অর্গলরাজান্তঃপুর-বাসিনীদিগকে নিরাপদ দেখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াই আসিয়াছেন। যতক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকিবেন, ততক্ষণ হস্তচালিত বিশ্বস্ত তরবারী দ্বারা উন্মত্ত শত্রুর বিস্তীর্ণ অস্ত্রকণ্টক মধ্যেও হিন্দুনারীর গৃহগমনের পথ প্রস্তুত রাখিবেন, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা।

দুইটি মহাপ্রাণ বীর যুবক এই উদ্ধার-কারী দলের নেতা,—অভয় চাঁদ ও নির্ভয় চাঁদ। উভয়েই বৈশ্য রাজপুত-সন্তান, সেই স্মরণীয় দিনে, একই সময়ে গঙ্গাস্নান-মানসে বল্লারঘাটে উপস্থিত। স্নানান্তে অভয় ও নির্ভয় যখন মুসলমান সৈন্যের অসম্ভব জনতা ও অস্ত্রসজ্জা দেখিলেন এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন অর্গলের ভুবনমোহিনী যশস্বিনী রাণী শত্রুর বেষ্টিত জালে বিপন্ন, তখন তাঁহারা চক্ষুর নিমেষে সেই ভাগীরথীর পুণ্যতটে, নিরীহ স্নানার্থীদের মধ্য হইতেই কয়েকটি

পরিচিত সহৃদয় সমবয়স্ক বন্ধু একত্রিত করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক অসাধারণ অনুরাগ ও কর্ত্তব্যবোধে উদ্দীপিত হইয়া এই ক্ষণকাল পূর্ব্বের শিষ্টশান্ত যুবকেরা দুর্দ্দমনীয় যুদ্ধপিপাসায় উন্মত্ত হইলেন। দৈবও যেন তাঁহাদের সাধু প্রতিজ্ঞার সহায় হইল,—সুশাণিত তরবারীর অভাব হইল না, আরও দুইটি চারিটি দশটি অপরিচিত হিন্দুসন্তান তাঁহাদের অপরিচিত বীর বন্ধুদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই স্বদেশপ্রেমিক, অসমসাহসী যুবকদল যখন তাঁহাদের সমবেত উদ্যত শাণিতাস্ত্র দ্বারা সহসা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিলেন, তখন অকস্মাৎ সেই অভাবনীয় ঘটনায়, মুসলমান পক্ষকে প্রথমে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল দেখা গেল, কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের বিশাল সেনার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্র একদল অস্ত্রধারীর হস্তে মুহূর্ত্ত-কালের মধ্যে শত শত সৈন্যবধ হইতেছে ও অর্গলের রাণীর সঙ্গে তাহারা অসম-সাহসে সম্মুখে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিতেছে, তখন তাহাদের পূর্ব্ব ক্রোধ দ্বিগুণিত হইল, তাহারা দারুণ ক্রুদ্ধ শোণিতলোলুপ পশুর ন্যায় হিন্দুদলকে আক্রমণ করিল। অর্গলরাজান্তঃপুর-বাসিনীগণের চারিদিকে হিন্দু মুসলমানে যে হৃদয়ভেদী মনুষ্যহত্যা আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনায় অতীত। মনুষ্যশোণিতে পথ ঘাট প্লাবিত হইল, জয়ধ্বনি ও আর্ত্তনাদ মিশ্রণে এক ভীষণশব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই অগণিত হতাহতের উপরে হিন্দুবীরদের ঘূর্ণিত তরবারী বেষ্টনে রাজরাণী তখনও তীব্রবেগে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। যুবকদের অমানুষিক সাহস, ধৈর্য্য ও একাগ্রতার গুণে কৃত-কার্য্যতা যেন সম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু হায়, এমনি সঙ্কটসময়ে বীরমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ নির্ভয়চাঁদ শত্রু-অস্ত্রে মারাত্মক আঘাতে ক্ষণকাল পরেই রাণীর সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিলেন। সহসা এই শোচনীয় ঘটনা হিন্দুযুবকদলের মর্ম্ম স্পর্শ করিল, কৃতজ্ঞ রাণী ও তাঁহার সহচরীদের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন কর্ত্তব্য তাঁহাদিগকে সেই পরম হিতকারী বীর বন্ধুকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তখন যুবকদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে একমাত্র অভয়চাঁদই অবশিষ্ট রহিলেন। তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে দেখিতে কয়েকটি প্রাণাধিক বন্ধু অনন্ত নিদ্রায় শায়িত হইলেন, ক্রমে তাঁহাদের জনবল কমিয়া আসিল। কিন্তু, তথাপি, অবশিষ্ট যুবকদলের অদমিত সাহস ও প্রতিজ্ঞার বল কিছুতেই কমিল না, তাঁহারা অসংখ্য-শত্রু-হস্তচালিত অস্ত্রের সম্মুখে আপনাদের হৃদয় পাতিয়া অর্গলের রাজান্তঃপুর-বাসিনীগণকে তখনও নিরাপদে গৃহা-ভিমুখে চালিত করিতে লাগিলেন।

সেই মুসলমান সৈন্য-সাগরের সঙ্গে

অর্গলের রাজরাণীর অদ্যকার এই অপূর্ব্ব রণাভিনয়ের সংবাদ দেখিতে দেখিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ক্ষণকালের মধ্যে বীর রাজা গৌতমের কর্ণেও এ সংবাদ পৌছিল। অর্গলের রাজমহিষী শত্রু-সেনা মধ্যে! সহসা তিনি বিস্মিত হইলেন! কিন্তু প্রকৃত কথা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তৎক্ষণাৎ বীর রাজা গৌতম অশ্বারোহণে অগ্রসর হইলেন; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অর্গল দুর্গ হইতে দলে দলে সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য শত্রুসেনার দিকে ধাবিত হইল।

অবিলম্বে বক্সার ও অর্গলের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে রাজার সহিত শত্রুপক্ষের সাক্ষাৎ হইল। রাজা তাঁহার সুনিপুণ সৈন্যদল সঙ্গে শত্রুসেনার ঘনসন্নিবিষ্ট মধ্যদেশ আক্রমণ করিলেন,—তখন যে স্থানে মুষ্টিমেয় হিন্দুযুবকদল তখনও শত্রুপক্ষের বিস্তীর্ণ সৈন্যব্যূহ অস্ত্রদ্বারা অপসারিত করিতে করিতে হিন্দু নারীদিগকে নিরাপদে অগ্রসর করিতেছিলেন, তাহার বিপরীত দিকের প্রান্তভাগে সহসা ভীষণ রণকোলাহল শোনা গেল। যেন মুহূর্ত্তকালের জন্য এই নূতন ঘটনায় উন্মনা হিন্দু যুবকদল ও তাঁহাদের শত্রু-পক্ষ পরস্পর মারাত্মক হত্যাকাণ্ডে নিবৃত্ত হইল। এমন সময়ে বুদ্ধিমতী রাণী সকলই বুঝিতে পারিয়াছেন। একবারে আনন্দ ও উৎসাহ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাণী বলিলেন,—"আর কি দেখিতেছেন? স্বয়ং অর্গল-রাজ, আমার প্রিয়তম স্বামী আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। ঐত হিন্দুসেনার উন্মত্ত জয়ধ্বনি শোনা যায়। ঐত তিনিই। আক্রমণের এমন সুনিপুণ কৌশল আর কাহার? অগ্রসর হউন, শত্রু বিনাশ করুন, পথ পরিষ্কার করুন, মহারাজার সহিত মিলিত হউন।" শুনিবামাত্র সেই রক্তাক্তকলেবর হিন্দু যুবকদল অসীম আনন্দে জয়ধ্বনি করিলেন, এই কথায় তাঁহারা অবসন্ন বাহুতে যেন নবীন বল লাভ করিলেন। তখন শত্রুসেনার উভয়দিক্ আক্রান্ত হইয়াছে। তাহাদের জয়লাভ অসম্ভব বোধ হইল। এক দিকে রাণী, আর এক দিকে রাজা, মধ্যস্থলে শত্রুসেনা অবিশ্রান্ত অস্ত্রাঘাতে মরিতে লাগিল। মুসলমান সেনাপতি বিপদ বুঝিবামাত্র পলায়নে তৎপর হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে উভয় হিন্দু বীরদলের মধ্যে যে শত্রুসৈন্যদল ছিল, তাহা অপসারিত হইল, তখন সেই শোণিতসিক্ত, মৃতদেহসমাকীর্ণ, উন্মুক্ত যুদ্ধক্ষেত্রের উপরে অশ্বারূঢ় রাজা ও রাণী উভয়ে উভয়ের দিকে ধীর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর! দূরে বিচ্ছিন্ন শত্রু-সেনা পলাইতেছে, এদিকে নিস্তব্ধ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপর একদিক্ হইতে রাজা, আর একদিক্ হইতে রাণী অশ্বারোহণে ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। দূর হইতেই উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। কিন্তু উভয়েরই মুখ ফুটিল না, উভয়েরই উত্তেজিত মুখশ্রীর সুমহান্

গাম্ভীর্য্য সামান্যমাত্রও পরিবর্ত্তিত হইল না —তাঁহারা যেন দুইটী শিল্পিহস্ত-খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তির মত জীবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। এই যে সাগরতরঙ্গের ন্যায় প্রবল শত্রুসেনার সহিত যুদ্ধে অসাধারণ বিজয়গৌরব, এই যে নিদারুণ বিপদের দৈবদুর্ব্বিপাকে বিচ্ছিন্ন প্রণয়ী দম্পতীর অপ্রত্যাশিত পুনর্ম্মিলন, ইহার আনন্দ রাজ-দম্পতী সেই মুহূর্ত্তে হৃদয়ে যথেষ্টই উপলব্ধি করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহারা তাঁহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস অসীম ধৈর্য্যের সহিত সংযমনপূর্ব্বক সেই বেষ্টিত অনুগত সৈন্যদলের সম্মুখে আপনাদের পদোচিত গৌরব ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতেছিলেন। সকলেই দেখিল রাণীর শ্রম-স্বেদ-কণাসিক্ত লোহিতাভ অপূর্ব্ব মুখশ্রী অসাধারণ গম্ভীর, কিন্তু অত্যুজ্জ্বল কৃষ্ণকান্তি বিস্ফারিত নয়নদ্বয় তাঁহার বীর পতির নয়নের সহিত একাগ্রে সম্বদ্ধ। সে দৃষ্টি কি আত্মানুযোগ ও ক্ষমা ভিক্ষা? কে জানে? সকলেই দেখিল বীর রাজা গৌতমের কৃতপ্রতিজ্ঞ উত্তেজিত মুখশ্রী অসাধারণ গম্ভীর, কিন্তু গর্ব্বব্যঞ্জক বিশাল নয়নদ্বয় তাঁহার নিরুপমা পত্নীর পলকহীন নয়নের সহিত নির্নিমেষে সম্বদ্ধ। স্বামীর সেই শীতল দৃষ্টি কি প্রিয়তমার প্রতি নীরব অভিমান? আর কেহ তাহার অর্থ বুঝিল না। সেখানে তখন কিঞ্চিদূন সহস্র অশ্বারোহী ধীরে ধীরে একটী বিশাল, কৃষ্ণবর্ণ জীবন্ত শৈল-প্রাচীরের ন্যায় তাঁহাদের প্রভুর সঙ্গে অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু সকলেই গম্ভীর, সকলেই নীরব, তাহারা কেবল অর্গলের অসামান্যা রাণী এবং তাঁহার সাহায্যকারী হিন্দু বীর যুবকদিগের প্রতি তাহাদের বিস্ময় ও ভক্তি মিশ্রিত দৃষ্টি একাগ্রে সন্নিবিষ্ট রাখিয়াছিল।

সেই বিপ্লব-ক্ষেত্রে রাজা ও রাণী যখন পুনরায় সম্মিলিত হইলেন, তখন সকলের সুখের পরিমাণ আমরা ভাষায় কি বুঝাইব? সুগভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাভাবে অবনতহৃদয় বীর রাজা গৌতম আগ্রহের সহিত সর্ব্বাগ্রে সস্নেহ-সম্মান-সহকারে নবীন যুবক বীর অভয়ের করপল্লব ধারণ করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার মনের সহস্র কথার এক কথাও তখন অভয়কে বলিতে পারিলেন না। কেবল অবশিষ্ট হিন্দু যুবকদিগের প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাতের সহিত গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—"তোমরাই মাতৃভূমির সু-সন্তান, তোমরাই পূজনীয় মহাবীর।"

সেখানে আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে সকলেরই হৃদয়ে এক নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস বহিতেছিল। হায়, নির্ভয়চাঁদ যদি জীবিত থাকিতেন! সেই সাধুহৃদয় বীরপুরুষ সুকঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া অম্লানমুখে আপন দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, এখন তাঁহারই প্রখর শোক-স্মৃতি সকলের হৃদয়ে জাগ্রত, তাই সকলের সঙ্গে সঙ্গে অর্গলরাজ-দম্পতীর নয়ন-প্রান্তে অশ্রুজল।

কিন্তু অন্তরের এই শোকস্মৃতি তখন অন্তরে রাখিতে হইল। উপস্থিত গৌরবকে সম্বর্দ্ধনা না করিলে নয়। যে স্বর্ণপ্রতিমা রাজলক্ষ্মীকে রক্ষা করিবার একমাত্র বাসনায় বীর নির্ভয়চাঁদ প্রাণ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়াছিলেন, সেই স্বর্ণ-প্রতিমা সর্ব্বথা নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছেন, নির্ভয়চাঁদের পবিত্র বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, ইহাতেই অবশেষে সকলে সমবেত স্বরে আনন্দধ্বনি করিলেন। সুখের সংবাদ দেখিতে দেখিতে দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, রাজা গৌতম তাঁহার প্রিয়তমা রাজলক্ষ্মীর সহিত উৎসবময়ী নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, সুগন্ধি পুষ্প-সমাকীর্ণ পথের উপর বীরদম্পতী ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইলেন, গীত-বাদ্য-নূপুর-নিকণের সহিত রাজধানী যেন সুখের হিল্লোলে ভাসিতে লাগিল। কিন্তু সেই সুখোৎসবের মধ্যেও রাজ-পরিবার এবং জনসাধারণ স্বর্গীয় বীর নির্ভয়ের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিতে ভুলিলেন না।

আরও এ কি? অর্গলের কুতূহলী নরনারী দেখিল সেই বিজয়োৎসবের মধ্যে অভিনব বিবাহোৎসবের মধুর বাদ্য বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে। রাজ-পরিবার যেন কি এক পবিত্র শুভ-সম্মিলন আকাঙ্ক্ষায় সেই উপলক্ষে সব গৃহ দ্বার তোরণ স্বহস্তে সাজাইতেছেন। বিস্মিত জনসাধারণ প্রথমে কিয়ৎকাল কিছুই বুঝিতে পারিল না, পরে দেখিতে দেখিতে শুভসমাচার প্রচারিত হইল—বালিকা রাজকুমারীর বিবাহ। অর্গলের রাজধানী হইতে প্রতি গৃহে, প্রতি নরনারীর কর্ণে সুধাধারার ন্যায় শুভসমাচার প্রচারিত হইল। বীর যুবক অভয়চাঁদের সহিত স্নেহ-পুত্তলি লাবণ্যলতিকা রাজদুহিতার বিবাহ। শুনিয়া স্বদেশভক্ত, রাজভক্ত নরনারীর সুখ যেন ষোলকলায় পূর্ণ হইল। অর্গল-রাজ্যের প্রত্যেক অট্টালিকা ও পর্ণকুটীর-বাসী যেন রাজগৃহের এই আনন্দের অংশী হইল। পবিত্র দেববালার মত সুন্দরী লাবণ্যবতী বালিকা রাজকুমারী বীরহৃদয়, সৎসাহসী, সুন্দর নবীন যুবক অভয় চাঁদের সহিত মধুর পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধা হইবেন, ইহাতে দেশের সকল নরনারী অকপটে আনন্দ প্রকাশ করিল। —কিন্তু রাজকুমারী যে বালিকা, আজিও বুঝি সুকুমারী নিরুপমা জননীর স্নেহ ক্রোড়-বিচ্ছিন্ন হইতে অথবা স্বামিসম্ভাষণ করিতে যাইবার উপযুক্ত হন নাই। কিন্তু তাহারই বা আর অধিক বিলম্ব কি? আর অভয় চাঁদও রূপে, গুণে, বয়সে—সর্ব্বাংশেই রাজকুমারীর উপযুক্ত বর। কাহারও মনে কোন সংশয় রহিল না। কাহারও মনে কোন নিরানন্দের ছায়া স্পর্শ করিল না! প্রেমিক রাজদম্পতী তাঁহাদের স্নেহপ্রতিমা কন্যাটিকে একটি যোগ্য বরের সহিত স্বর্গীয় প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দিলেন। সুখে দুঃখে রাজকুমারী তাঁহার হইলেন, তিনি রাজকুমারীর হইলেন। মহাপ্রাণ অর্গলরাজ ও তাঁহার

প্রিয়তমা পত্নী জগতে এমন আর কিছু অমূল্য পদার্থ পাইলেন না যদ্দ্বারা অভয় চাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতে পারেন, তাই প্রাণাধিকা স্নেহ-লতিকা দুহিতা সমর্পণে কিয়ৎপরিমাণে মনের আশা পূর্ণ করিলেন। শুভবিবাহের যৌতুক স্বরূপ শুধুই দ্রব্যসম্ভারে রাজ-দম্পতীর হৃদয় তৃপ্তি মানিল না, সেই সঙ্গে অর্গলরাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী ভাগীরথীর সমগ্র উত্তর প্রদেশ কন্যা জামাতাকে উপহার দিলেন। শ্রীমান্ অভয় চাঁদ- বৈশ্য রাজপুত সন্তান। বিশুদ্ধ রাজপুতের তুলনায় বৈশ্য রাজপুতেরা অপেক্ষাকৃত হীনভাবে গণ্য, কিন্তু তথাপি জামাতার মহদ্‌গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে রাজা ও রাণী বৈশ্য-রাজপুতকে আপন বংশে গ্রহণ করিলেন, —জামাতা অভয় চাঁদকে গৌরবান্বিত "রাও" উপাধি অর্পণে সমুদায় বৈশ্য-রাজপুত সন্তানের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

এই সত্য কাহিনীর নায়ক নায়িকারা যে দেশে একদিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যদেশ আজিও যেখানকার সেখানেই আছে, কিন্তু তথাপি সে দেশ আর নাই! যে ধর্ম্মাত্মা রাজা গৌতম উদার-হৃদয়, আদর্শ চরিত্র ও অসাধারণ বীরত্বের জন্য ভারত-বিখ্যাত ছিলেন, তিনি আর নাই; যে অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশালিনী রাজরাণী অনুপম সুন্দর স্বভাব, স্বদেশ-প্রেম ও বীরপূজাপ্রবৃত্তির জন্য সকলেরই হৃদয়ের আবেগপূর্ণ ভালবাসা লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও আর নাই; যে অপরিচিত নবীন যুবক অভয় ও নির্ভয় চাঁদ নদীর ঘাটে অগণিত শত্রুসৈন্যের অস্ত্ররাশির মধ্যে আপনাদের হৃদয় পাতিয়া দিয়াও অপরিচিত অসহায়া রমণীদিগকে নিরাপদে রক্ষা করাকে সম্ভ্রান্ত রাজপুতের অবশ্য-কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলেন, তাঁহারাও আর নাই। নিদারুণ কালের প্রভাবে তাঁহারা সকলেই অন্তরালে অপসারিত; কিন্তু তথাপি আজিও সে দেশের নরনারীর বুকে তাঁহাদের মধুর সুখস্মৃতি সজীব আছে। আজিও সেথায় সায়াহ্নে মধ্যাহ্নে কৃষক-কুটীরে অথবা গৃহস্থগৃহে, শ্রম অথবা বিশ্রামের মধ্যে সুকণ্ঠ ললনারা আকুল হৃদয়ে তাহাদের অনুপমা সুন্দরী মহারাণীর গীতি-ইতিহাস গান করে।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

কাশি।

১। আদার রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশি নিবারিত হয়।

২। কণ্টিকারীর রসে অথবা বাকস ছালের রসে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা তুলসীপত্রের রস মরিচের গুঁড়াসহ সেবনে কাশরোগের উপশম হয়।

৩। মুখে গঁদ ও মিছরী কিম্বা হরীতকী ও যষ্টিমধু অথবা লবঙ্গ বা কাবাব চিনি রাখিলে, কাশির বেগ শান্ত হয়।

৪। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, কিম্বা একটী পাতি লেবু গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে এবং সেই লেবু ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘৃতে আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত গাওয়া ঘৃত অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশির লাঘব হয়।

৫। বাকস পাতার রস কাঁচা ধানেক লইয়া সেইরূপে কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তিন চারি দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৬। পুষ্করিণীর পাড়ের আম্রগাছের অর্দ্ধ জলপচা পাতা দিয়া নূতন হাঁড়ি করিয়া এক সের জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইয়া ২।৩ দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৭। কাবাব চিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে কিম্বা মিছরী ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৮। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, অল্প পাথরকুচি পাঁচটী গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইলে অথবা কাল অপরাজিতার পাতার রস বুকে ও মাথায় মালিস করিলে অথবা অনেক দিনের পুরাতন তেঁতুল পূর্ব্ব দিবস সন্ধ্যার সময় একটী পাথরবাটিতে ভিজাইয়া রাখিয়া তাহার স্বচ্ছ জল প্রতিদিন প্রাতে সেবন করিলে হাঁপানি রোগের শান্তি হয়।

৯। কটফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গন্ধতৃণ, বামুনহাটী, ধনে, মুতা, বচ, হরীতকী, ক্ষেতপাপড়া, শুষ্ঠি, দেবদারু, এই কাথে ।০ আনা মধু এবং এক রতি হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত ও কফোত্থিত কাশ, কণ্ঠরোগ, ক্ষয়রোগ, হিক্কা, শ্বাস প্রভৃতি নষ্ট হয়।

বর্ষ-শেষ-চিন্তা।

সখি সেফালি! আমি স্বপনে রয়েছি, আমাকে কেন জাগালে? যদি শোকাশ্রু-পূর্ণ অন্ধ নয়নকে উন্মীলনের শক্তি দিতে পারিয়াছ, তবে কি মলিনহীন আত্মাটুকুকে বিশ্ব-প্রেমের দীক্ষা দান করিয়া সঞ্জীবিত করিবে না? আমার শৈশব-সঙ্গিনী সেফালি! তুমি এখনও সেই হাস্যময়ী, কুসুম-কোমলা ও আশালতারূপিণী। এ রোগ-শোক-দগ্ধ, হীনতাতে নিমজ্জিত, মৃতপ্রায় আত্মার সম্মুখে বিশ্বাস-প্রদীপটী হস্তে ধরিয়া মুমূর্ষু আত্মাতে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রেম, ও ভালবাসা জানাইতেছ! তোমার শীতল ছায়াতে

আশ্রয় লাভ করিয়া, "সাহারাতে" বিচরণ করিতে করিতে মরীচিকা দর্শনে ভ্রান্ত, অন্ধের ন্যায় লক্ষ্যবিহীন, উদ্দেশ্যহারা, বাণবিদ্ধ মৃগতুল্য ছুটা ছুটী করিয়া বিনাশের পথে ধাবিত হইতেছিলাম। কে আমাকে দিবা আবার সঙ্গীত শুনাইতেছে? সঞ্জীবিত করিবার জন্য কোমল দক্ষিণকর সঞ্চালনে আজ এ গভীর যামিনীতে মধুর স্বরে আবাহন করিতেছে? সেফালি! শৈশবসঙ্গিনী! তুমি সর্ব্বদাই নিকটে। প্রেমের নীরব আকর্ষণে টানিয়া মহাশক্তিপূর্ণ অনন্ত বারিধিনীরে কি সঙ্কীর্ণ আবিল ও আবর্জ্জনা-পূর্ণ ক্ষীণ স্রোতকে মিশাইতে চাও? কালরূপসিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল বৎসর, উঠিল কালের ঊর্ম্মি। তরঙ্গ আঘাতে নিত্যগামী রথচক্র, আবার ঘুরিল অনন্ত কাল সাগরের আয়ুর পথে। এই সঙ্গম-স্থলে দাঁড়াইয়া জগতের কতই মায়ার খেলা লক্ষ্য করিতেছি। আপনা ভুলিয়া, তাঁহাকে লইয়া অনন্ত স্রোতোমুখে এ ভগ্ন তরী ভাসাইয়া দিবার জন্য হৃদয়ে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সম্মুখে কাল-সাগরের ভীষণ উচ্ছ্বল বীচিমালা প্রবৃত্তির ঘূর্ণিপাকে জীবন তরীখানা চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য মহা আয়োজন করিয়া অট্টহাস্যে ভীত প্রাণকে কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। আজ আমি কাল সাগরের বেলাভূমিতে একান্তই যে একা। তাই ভীতি-বিহ্বল হৃদয় ত্রাসে ডুবিতেছে। একখণ্ড উপল সঞ্চয়ও কি এ দুরাকাঙ্ক্ষ-ভাগ্যে ঘটিবে না? এখনই যে পুরাতন, অতীতকাল সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ভাবিতেছি "আপনার তরে মরে যেই জন, মরণে তাহারি ব্যথা। মুছায়ে পরের বিষাদের ধারা, বাঁচায়ে পতিপ্রাণ কি সুখ মরণে, যে মরে সে জানে কি আনন্দ! বলিদান। সমবেদনার নির্ম্মল উৎস সেফালী! ত্রিদিব দুয়ার, খোল একবার, দেখিব মায়ের ছবি। শয়নে স্বপনে স্বজনে, বিজনে যে মূরতি মোর সার। জনমের তরে দেখ্‌বে কি সখি! সে মুখ অমিয়া-মাখা? বোন সেফালি! সংসার-মোহে অন্ধ এ ভ্রান্ত ও শ্রান্ত পথিকের কর্ণে খাম্বাজ রাগে আশার মোহন গীতিধ্বনি ভাল করিয়া কি শুনাইবে বা যে আশা বিজলী দেখাইতেছ, তাহা কি চপলারূপিণী নয়, কিন্তু স্থির সৌদামিনী রূপে, এ আঁধার আবর্জ্জনাপূর্ণ রাজ্যে জ্যোতি বিকাশ করিবে? ভাঙ্গা আর গড়া অবরুদ্ধ জীবন প্রবাহের নিত্যকাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন উপাস্য দেবতা কি বর্ষশেষের এ তীর্থসঙ্গম ভূমিতে খুঁজিয়া মিলিবে না, যাঁহাকে হৃদয়-সিংহাসনে বিশ্বাস প্রেম ও ভক্তি কুসুমের অঞ্জলী সহকারে অর্চ্চনা করিয়া জীবন ধন্য করিবে, সেই অধিষ্ঠাত্রী, মঙ্গল-রূপিণী জননী কোথায় লুকাইয়া আছেন বল বোন সেফালি! বলিয়া দাও যে পুরাতনকে নূতনরূপে আশ্রয় করিয়া একটু বিশ্বাস, প্রেম, ভালবাসার শীতল

ছায়া লাভ করিয়া ত্রাসিত হৃদয় একবিন্দু বিরাম লাভের আয়োজন করিতে মহা ব্যস্ত ছিল, নূতনের রাজ্যে ভগ্ন তরণী কোন মতেই আওয়ায় হইতে চাহিতেছে না। আবার এ অচেনা বন্ধুর দোষ "নূতনতা"। নূতন আলাপ প্রেম ও সখ্যতার মিলন প্রয়াস কি এ শ্রান্ত পান্থের পক্ষে সম্ভবে? তাই বোন সেফালি! একাই ভাবিতেছি "মোহময় সংসারে থেকে কেমন করে পাইব তাঁহায়। আমি যতনে বাঁধিয়া প্রাণ দিতে চাই তাঁহারে, পথ মাঝে প্রলোভন ঘিরেছে আমারে। ভীষণ তরঙ্গ দেখে ভয়ে প্রাণ কাঁপে অনিবার।"

বর্ষশেষ দিনে।

নীরবে এসেছ বর্ষ, নীরবে যেতেছ ভাল,
আমাকে যা দিতে চাও, নিঃশব্দ নীরবে
ঢাল।
নীরবে বহিছ ধুনী, নীরবে সমীর ববে,
মোর সাথে ভবঘরে নীরবে খেলিতে হবে।
নীরবে বরষা সুধা ঢালিয়াছে কাদম্বিনী,
নীরবেই মোর বীণা গাবে "পূরবী"
রাগিণী।
নীরবে ফুটেছে সখি, নীরবে শুকাল আশা,
নীরব হৃদয় মোর পেয়েছে শোকের ভাষা।
নীরবে তারকা-মালা মোর পানে আছে
চেয়ে,
আবাহন, বিসর্জন নীরবেই গেছে স'য়ে।
বসন্ত শরৎ মোর নীরবেতে ঘুরে এসে,
নীরব অটল ভাবে কতই না ভালবাসে!
নীরবে জাহ্নবী-বুকে মিশায়েছি অশ্রুধারা,
নীরবে দেখেছ বর্ষ! কত ভালবাসে তারা।
নীরব প্রভাত মম নিঝুম সাঁঝের বেলা,
আমি যে এসেছি ভবে খেলিতে নীরব
খেলা।
নীরব গম্ভীর অই শ্মশানের একপাশে,
নীরব সাধনা নিতি হৃদয়েতে ছুটে আসে।
জীবনের আশা-ছবি নীরবে মিশায়ে গেল,
সুধুই বিষাদ-ছায়া পরাণেতে ঢেলে দিল।
নীরবে উপাস্য আসি কেন মোরে দেখা
দিল?
হিয়ার মাঝারে পুনঃ আশালোক
বিরাজিল?
নীরবে যে মহাশক্তি এই ভবে নিয়ে এল,
নীরবে গাহিয়া গীতি তাঁরি পানে ছুটি চল।
নীরবেতে প্রাণটুকু তাঁরি পদে সমর্পিয়া,
বৈতরণী তীরে মোর নীরব হইবে হিয়া।
পুরাণ বছর মোর অসীম আদর ধন,
যাও চলে—মৃতপ্রাণে সঞ্চারি নব-জীবন।

কেন বহে আঁখিজল ?

১

আজি
কেন বহে আঁখিজল ?—
যা ছিল কামনা, কিছুই হল না,
জলবিম্ব হল জল !—
শ্রান্ত দেহ হায়, চাহিছে "বিদায়",
এ জীবন অ-সফল !
তাই বহে আঁখিজল।

২

কেন বহে আঁখি জল ?—
লয়ে কত আশা ধরাতলে আসা,
কার্য্য-ক্ষেত্র ভূমণ্ডল,
কতই শিখিব, কতই খাটিব,
কতই উদ্যম বল !—
আজ শুধু আঁখি-জল।

৩

কেন বহে আঁখি-জল ?—
ধর্ম্মজ্ঞান ধনে, অর্জ্জিয়া যতনে
পূরিব হৃদয়-তল ;
বিধাতার পা'য়, সঁপি আপনায়
হয়ে রব নিরমল !—
তাই বহে আঁখি-জল।

৪

কেন বহে আঁখি-জল ?—
কই সে শকতি, কই সে ভকতি,
কই সে মনের বল ?—
"অসার সংসার" হইয়াছে সার,
রিপুকুল মহাবল !
তাই বহে আঁখি-জল !

৫

কেন বহে আঁখি-জল ?—
প্রাণপ্রিয় কাজ, অসমাপ্ত আজ,
মৃত আমি, শূন্যবল,
রহিয়াছি পড়ি—হরি ! হরি ! হরি !
তুচ্ছ চিন্তা অবিরল !
তাই বহে আঁখি-জল।

৬

কেন বহে আঁখি-জল ?—
হৃদি উপবন, বিশুষ্ক কানন,
ঝরে গেছে ফুলদল,
উড়েছে বিহঙ্গ, ফিরিছে ভুজঙ্গ,
ঘুরিছে শ্বাপদ-দল !
তাই বহে আঁখি-জল।

৭

কেন বহে আঁখি-জল ?—
পরার্থ-পরতা, প্রেম,উদারতা,
গেছে বুঝি রসাতল ?
কোথা মনুষ্যত্ব, কোথা বা মহত্ত্ব ?
স্বার্থভরা সর্ব্বস্থল !—
তাই বহে আঁখি-জল।

৮

কেন বহে আঁখি-জল ?—
কোথা সত্য ধর্ম্ম, হে নিষ্কাম কর্ম্ম,
আনন্দের কোলাহল ?

কোথা হে উন্নতি? মানব-শকতি
এত ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল!—
সার শুধু আঁখি-জল?

৯

সার শুধু আঁখি-জল?—
হে বিশ্ব-জীবন! এ তুচ্ছ জীবন
কেমনে ফিরায়ে দিব?—
এত যে কামনা কিছুই হল না,
শুধুই বিদায় নিব?—
কেন দিলে নাথ, মানব-জনম,
কেন দিলে বোধ, বল?
তাই বহে আঁখি-জল।

লেখিকা
শ্রীমা।

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

(৪০৮-৯ সংখ্যার ৩২৯ পৃষ্ঠার পর)

জীব সংসারে থাকিয়া কিরূপে শ্রীরাধা কৃষ্ণের অমৃতময় প্রেমাস্বাদন করিয়া আত্মকৃতার্থতা লাভ করিতে পারে, তাহাই শিখাইবার জন্ত শ্রীগৌরাঙ্গ মরভূমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সংসারে অবস্থানকালে সংসারী জীবের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছেন। অনন্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারী ও বৈরাগী জীবকে যথোচিত কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করিয়াছেন। সংসারী জীবদিগকে যেমন সংসারে থাকিয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন, বৈরাগীদিগকে তদ্রূপ সংসার হইতে দূরে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। বৈরাগীদিগের প্রতি মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

"......বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥"
শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত।

কিন্তু আধুনিক বৈরাগিগণ মহাপ্রভুর এই অমূল্য উপদেশ সকল অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রবল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছেন। ইহাঁদের জন্তই আজ মহাপ্রভুর পবিত্র ধর্ম্মে কলঙ্কারোপ হইতেছে। সংসারে যত কিছু মোহ আছে, সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীলোকের মোহই প্রবল, তাই শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়াছেন,—

"দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।" চৈঃচঃ

অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত নারীদর্শনেও জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের চিত্ত-বিকার ঘটে।

জীব সকল প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের অমূল্য উপদেশাবলী যতই ভুলিয়া যাইতেছে, ততই তাহাদিগের অধঃপতন ঘটিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারাশ্রমে থাকিয়া সম্যক্-রূপে তাঁহার উদ্দেশ্য পালন করিতে পারেন নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে অবস্থান করিয়া জগতে অপূর্ব্ব প্রেমের বন্যা বহাইয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের বিকাশ করিয়াছিলেন। যখন

সমগ্র জীব আসিয়া প্রেমময়ের শীতল চরণে আশ্রয় লইল, তখন শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য (প্রবাদ ইহাঁরই আকর্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন) শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এক তরজা লিখিয়া পাঠাইলেন। যথা,—

"বাউলকে কহিও সবে হঞাছে বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"
চৈঃ চঃ।

তাৎপর্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের অমৃতময় প্রেমে জগৎ ডুবিয়াছে, আর প্রেমরূপ চাউল গ্রহণের লোক নাই, এখন তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

এই তরজা প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমোন্মাদ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। তিনি গম্ভীরায় রাত্রে শয়ন করিতেন। একদা নিশীথে প্রেমোন্মাদ অবস্থায় গম্ভীরা ত্যাগ করিয়া শ্রীজগন্নাথের সিংহদ্বারে গিয়া পড়িয়াছেন। ভক্তগণ প্রভুকে না দেখিয়া ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া অবশেষে সিংহদ্বারে তাঁহার দর্শন পাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত হইতে হয়। শ্রীচরিতামৃতে সে বর্ণনা এইরূপ,—

"সিংহদ্বারে উত্তর দিশায় আছে একঠাঁই।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞী॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞী আদি আনন্দিত হৈলা,
প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিতে লাগিলা॥
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাশায় শ্বাস নাহি বয়॥
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পাদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধি আছে দীর্ঘ হঞা।
দুখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেন প্রভুর উত্তান নয়ন॥"

প্রেমের এরূপ অদ্ভুত বিকার প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অন্যত্র,—

"প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার॥
কণ্ঠেতে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার।
দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার॥
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা যমুনাধার॥
বৈবর্ণ শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ।
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ॥"

এই সময় প্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারসে নিমগ্ন থাকিতেন। অভ্যাস-বশতঃ বাহ্যকৃত্য সমাধা করিতেন মাত্র। তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রেমলহরী উচ্ছ্বসিত হওয়ায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা ব্যতীত তাঁহার নয়নপথে আর কিছুই স্থান পাইত না। একদা তিনি প্রেমোন্মাদে অচেতন হইলে ভক্তগণ শুশ্রূষাপূর্ব্বক তাঁহাকে চেতন করাইলে তিনি বলিতেছেন,—

"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইনু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র মন॥"
চৈঃ চঃ।

আবার কখনও রাধা ভাবে ভবিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া হারাইয়াছেন, তাই বলিতেছেন,—

"......কৃষ্ণ মুই এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দৈবে পুন হারাইনু॥" চৈঃ চঃ।

প্রেমময় গৌরসুন্দর শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া যখন বিলাপ করিতেন, সে বিলাপই বা কি প্রাণস্পর্শী!! পাঠিকা ভগিনীদিগের জ্ঞাপনার্থে একস্থল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথা,—

"হাহা কৃষ্ণ প্রাণধন, হাহা পদ্মলোচন,
হাহা দিব্য সদ্গুণ সাগর।
হাহা শ্যাম সুন্দর, হাহা পীতাম্বরধর,
হাহা রাস বিলাস নাগর!
কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা যাই,
এত কহি চলিলা ধাইয়া।" চৈঃ চঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ উদিত হইলে প্রভু একেবারে বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িতেন। এক দিন,—

"বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা।
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার॥
সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ।"
চৈঃ চঃ।

শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"একদিনে যত হয় ভাবের বিকার।
সহস্র মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার॥
চৈঃ চঃ।

বস্তুতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের অমূল্য চরিত্র বিচারের দ্রব্য নহে, উপভোগের বস্তু। এরূপ অতুলনীয় প্রেম একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গেই সম্ভবে। তিনিই তাঁহার তুলনা। এই অমূল্য প্রেমই শ্রীগৌরাঙ্গের ভগবত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে!

পাঠিকা ভগিনীগণ! তোমরা প্রেমময় শ্রীগৌরসুন্দরের কমনীয় চরিত্র উপভোগ কর। আমরা এক্ষণে প্রেমময়ের শ্রীচরণে প্রণতিপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

হিন্দু নীতি।

১। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখ হয় না, অতএব ধর্ম্মে তৎপর হইবে। যে অর্থ ও কামে ধর্ম্ম না থাকে, তাহাতে প্রবৃত্তি করিবে না। অর্থ ও কামের সহিত ধর্ম্মের যোগেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

২। কেশ, নখ এবং শ্মশ্রু এই সকলকে খর্ব্ব করিবে।

৩। ছত্র এবং পাদুকা সহিত চারি হস্ত পরিমাণ পর্য্যন্ত দর্শন হয়, এই ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক গমনাগমন করিবে।

৪। মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিবে না।

৫। জীবহত্যা, অপহরণ, অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবা, খলতা, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ব্যবহার, অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ, অবিনয়, নাস্তিকতা, এবং অবৈধ আচরণ এই দশ

প্রকার পাপ কার্য্য শরীরের দ্বারা কিম্বা বাক্যের দ্বারা অথবা মনের দ্বারা করিবে না।

৬। জীবিকারহিত, রোগপীড়িত এবং শোকার্ত্ত ব্যক্তিগণের সাধ্যানুসারে উপকার করিবে।

৭। কোন শত্রু যদ্যপি অপকার করে, অপকার করিবার শক্তি থাকিলেও তাহার উপকারই করিবে।

৮। ইন্দ্রিয়গণকে অত্যন্ত পীড়িত বা উত্তেজিত করিবে না।

৯। বয়ঃস্থা ভগিনী বা কন্যা অথবা মাতার সহিতও বয়ঃস্থ পুরুষ একাকী অতিশয় নির্জ্জন স্থানে বসতি করিবে না।

১০। পর পুরুষের সহিত একত্র বাস, যথেচ্ছ কথোপকথন, এবং পরের গৃহেতে অবস্থিতি, ইহা স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে নিতান্ত গর্হণীয়।

১১। পতি যদ্যপি ক্রোধপরায়ণ হয়, কিম্বা উৎপীড়ক হয়, কিম্বা চিরপ্রবাসী, দরিদ্র, রোগী, অথবা অন্য স্ত্রীতে রত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী অনুরক্তা হয় না, অথবা অন্যপুরুষকে আশ্রয় করে, অতএব এই সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীগণকে রক্ষা করিবে।

১২। যাহার যেমন শক্তি, তদনুসারে বস্ত্রের দ্বারা, অন্নের দ্বারা, ভূষণের দ্বারা, স্নেহের দ্বারা এবং মধুর বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা নিকটে রাখিয়া স্ত্রী ও সন্তানগণকে সুখী করিবে।

১৩। চিতা সম্বন্ধীয় কাষ্ঠ প্রভৃতি, পূজনীয় ব্যক্তি, ধ্বজ, প্রশস্ত বস্ত্র, ছায়া, ভস্ম, তুষ, ও পূজার উপকরণ উল্লঙ্ঘন করিবে না।

১৪। শরীরের কোনও অঙ্গের বিকৃতি বা অপব্যবহার করিবে না। ঊর্দ্ধজানু হইয়া অধিকক্ষণ স্থিতি করিবে না। রাত্রিতে বৃক্ষ, চত্বর, চিতার স্থান, চতুষ্পথ ও দেবালয়েতে অবস্থিতি করিবে না।

১৫। নির্জ্জনকানন ও শ্মশানস্থানে অসতর্কভাবে দিবাতেও গমন করিবে না।

১৬। সূর্য্যকে সর্ব্বদা অবলোকন করিবে না। শুভ্রবস্ত্র, দীপ্তিযুক্ত পদার্থ, এবং অপবিত্র ও অপ্রিয় দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি করিবে না।

১৭। রাজধর্ম্ম, দেশধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম ইহাদিগকে দূষিত করিবে না; এবং বিনা কারণে লোকাচারকেও উল্লঙ্ঘন করিবে না।

১৮। আমি সহস্রপ্রকার পাপশীল, অতএব একটী পাপের দ্বারা আর আমার কি হইবে, এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অতি সামান্য পাপ করিতেও ইচ্ছা করিবে না।

১৯। মাতা, পিতা, গুরু, স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, পুত্র ও সখা ইহাদিগের মধ্যে কাহারও সহিত বিরুদ্ধাচরণ কি ইহাদিগের কোনমতে অপকার মনের দ্বারাও করিবে না।

২০। স্বজনের সহিত বিবাদ, প্রবল ব্যক্তির সম্মুখে স্পর্দ্ধা, এবং স্ত্রী, বালক,

বৃদ্ধ ও মূর্খের সহিত বাদানুবাদ কথনই করিবে না।

২১। অপরের ধর্ম্মকে আশ্রয় করিবে না এবং অপরের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রোহীও হইবে না। আর যাহারা হীন কর্ম্ম ও হীন গুণ অবলম্বন করে, তাহাদিগের সহিত একাসনে কদাপি উপবেশন করিবে না।

২২। আপনার দৈন্যভাব কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবে না। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে কাহারো নিকট গৃহ-কথা প্রকাশ করিবে না।

২৩। শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিবে না।

২৪। আপৎসময়ে কোন কার্য্যে বিচলিত না হইয়া সাধ্যানুসারে কার্য্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।

২৫। কাহারও মর্ম্মান্তিক যাতনা কি কাহারও প্রতি কোন মতে মিথ্যাপবাদ প্রদান করিবে না।

২৬। কোন গুপ্ত কথা সহসা ব্যক্ত করিবে না। সকল লোকের প্রতিই সর্ব্বদা সদ্ভাব রাখিবে। সর্ব্বদা বহুদর্শী ও প্রত্যুৎপন্নমতি হইবে। দীর্ঘসূত্রী হইবে না।

২৭। পুত্র হউক, ভ্রাতাই হউক, ভার্য্যাই হউক, অমাত্যই হউক, অথবা কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীই হউক, ইহাদের কোন ব্যক্তিকেই সর্ব্বদা অতি-বিশ্বাস করিবে না।

২৮। কথনই উগ্রদণ্ড ও কটুবাক্য ব্যবহার করিবে না, সর্ব্বদাই সুমধুর বাক্য ব্যবহার করিবে।

২৯। বিদ্যার দ্বারা, কি শৌর্য্যের দ্বারা, কি ধনের দ্বারা, কি কৌলীন্যের দ্বারা কদাপি প্রমত্ত ও অভিমানী হইবে না।

৩০। আপনার কার্য্য সাধন করিতে ইচ্ছা করিলে মান পরিত্যাগ করিয়া অতি কুৎসিত কুল হইতেও বিদ্যা, মন্ত্র ও ঔষধ যত্নের সহিত গ্রহণ করিবে।

৩১। বালক ও স্ত্রী * ইহাদিগকে অত্যন্ত লালিত কিম্বা অত্যন্ত পীড়িতও করিবে না। বালককে সর্ব্বদা বিদ্যার অভ্যাস বিষয়ে ও স্ত্রীকে গৃহকার্য্যে নিয়োজিত করিবে। কন্যাকে পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

৩২। পরের দ্রব্য অতি ক্ষুদ্র হইলেও সে প্রদান না করিলে গ্রহণ করিবে না।

৩৩। সর্প, অগ্নি, দুর্জ্জন, রাজা, জামাতা, ভাগিনেয়, রোগ, এবং শত্রু ইহারা ক্ষুদ্র হইলেও অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া অবহেলা করিবে না।

৩৪। ঋণের শেষ, রোগের শেষ এবং শত্রুর শেষ রাখিবে না। যাচকগণ কিছু প্রার্থনা করিলে তাহাদিগের প্রতি কর্কশ উত্তর প্রদান করিবে না, এবং সমর্থ হইলে তাহাদিগের প্রার্থনা স্বতঃ পরতঃ পূর্ণ করিবে।

---

* হিন্দু-গৃহে মূর্খা স্ত্রী অজ্ঞান বালকদিগের মধ্যে গণ্যা, সুতরাং তাহার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহারের উপদেশ আছে। শিক্ষিতা উন্নতচরিত্রা স্ত্রীগণের পক্ষে এ কথা প্রযোজ্য নহে।

৩৫। দাতৃগণ, ধার্ম্মিকগণ, শূরগণ— ইহাদিগের গুণ ও কীর্ত্তি সর্ব্বদা শ্রবণ করিবে। কদাপি ইহাদিগের দোষের প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

৩৬। যে কলহের দ্বারা ইষ্ট সাধন হয়, সেই কলহ উত্তম; কিন্তু তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার কলহ করিলে সেই কলহ আয়ুক্ষয়, ধননাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, যশের লাঘব ও সুখক্ষয়ের কারণ হয়।

৩৭। গুরুজনকে, দুর্ব্বলকে, রোগীকে, শবকে, রাজাকে, মাননীয় ব্যক্তিকে ও ব্রহ্মচারীকে পথ ছাড়িয়া দিবে।

৩৮। মাতা, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃপত্নী এবং সপত্নীর কোন অপরাধের কথা স্ত্রী ব্যক্ত করিলে তাহা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া কদাপি অনুমোদিত করিবে না।

৩৯। কেহ আততায়ী হইয়া বধ করিতে উদ্যত হইলে আত্মরক্ষার্থ তাহাকে বধ করা অন্যায় নহে।

৪০। পিতা প্রভৃতি গুরুজন এবং রাজার সম্মুখে চরণ উত্তোলিত করিয়া বা উচ্চ আসনে উপবেশন করিবে না; এবং তর্ক-বিতর্ক স্থলেও তাহাদিগকে অবজ্ঞা বা অবমাননা করিবে না।

৪১। যে পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ও ভবিষ্যতে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যত্ন করেন, এবং নিত্য নীতি শিক্ষা প্রদান করেন, সেই পিতাই প্রীতিপ্রদ হইয়া পুত্রের ঋণ হইতে মুক্ত হন।

৪২। অর্থরক্ষা, সাংসারিক ব্যয় রন্ধন, গৃহসামগ্রীর পর্য্যবেক্ষণ এবং শুচিত্বসম্পাদনে পত্নীকে নিযুক্ত রাখা পতির একান্ত কর্ত্তব্য।

৪৩। দেবতা, বেদ, নৃপতি, সাধু, তপস্বী ও পতিব্রতা নারীর নিন্দা কদাচ করিবে না।

৪৪। উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের আশা করিবে না।

৪৫। অধর্ম্ম করিলে প্রথমে বৃদ্ধি, শত্রুজয় ও সুখসমৃদ্ধি হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়।

৪৬। দেশ ও কাল বিশেষে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রে দান করিবে। যাহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান ও প্রতিগ্রহ করে, সেই দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই স্বর্গ লাভ করে। অশ্রদ্ধায় দান কিংবা প্রতিগ্রহ করিলে অধঃপতন হয়।

৪৭। পুণ্য কর্ম্ম, ভার্য্যা গ্রহণ, কৃষিকর্ম্ম, মহৎসেবা ও নিজের উপভোগ্য বিষয়ে প্রতিনিধি চলে না।

৪৮। গৃহস্থের অন্তঃপুরে সচ্চরিত্র, বিশ্বস্ত, আচারনিষ্ঠ বৃদ্ধ পুরুষ বা স্ত্রীকে পরিচর্য্যার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবে।

৪৯। সাধু ব্যক্তি অন্যের কৃত অল্প উপকারও প্রচুর মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু খল বৃহৎ উপকারকে সর্ষপ হইতেও ক্ষুদ্র মনে করে।

(ক্রমশঃ)

কোথা তুমি ?

সুখ আশা পরিহরি
তোমারি চরণ স্মরি
আসিয়া পড়েছি আজ বহু দূরে দূরে;
বড়ই হয়েছি শ্রান্ত
লক্ষ্যহারা পথভ্রান্ত,
বল দেব কোথা তুমি? আছ কোন্ পুরে?

শত কাঁটা বিধিয়াছে,
শত অশ্রু ঝরিয়াছে,
শত আশা একে একে নিবিয়া গিয়াছে;
শত কৌমুদীর রাশি,
উদিত যেথানে আসি,
আঁধারের ঘন ছায়া সেথা মিশিয়াছে।

মরমের কত কথা,
হৃদয়ে ছিল যা গাঁথা,
একটি একটি করি ঝরে গেছে সব;
দূর স্বপনের মত,
দু' একটি রেখা তার,
কেন আসি প্রাণে মোর ঘটায় বিপ্লব?

সুখ শান্তি কথা দুটী,
স্মরিলে আসিত ছুটি,
আর তারা আমাপানে ফিরে নাহি চায়;
আশা! সেত মরীচিকা,
ছলিয়া আমারে একা,
মরু-মাঝে ফেলে পুন আরো সরে যায়।

দূরে কত লোক যায়,
কেহ নাহি ফিরে চায়,
অসহায় ব'লে কেহ কাছে নাহি ডাকে;
যদি কারো পাশে আসি,
হাসিয়া ঘৃণার হাসি,
অবহেলে দ'লে যায় ফেলিয়া বিপাকে।

কোথায় আশ্রয় পাই,
কে মোরে দিবেগো ঠাঁই,
এ আঁধারে কে ফুটাবে আশার আলোক;
অযাচিত স্নেহরাশি,
কে হেথা ঢালিবে আসি,
বিনাশিয়ে হৃদয়ের এ অনন্ত শোক?

পাষাণে গঠিত দেশ,
নাহি দয়া মায়া লেশ,
(হেথা) নিরাশায় আশা দিতে কেবা আছে আর?
কে দেখিবে অভাগারে,
তুমি বিনা এ সংসারে,
কে মুছাবে তাপিতের তপ্ত অশ্রুধার? শ্রীঅ—

রোগীর শুশ্রূষা।

সংসারের কার্য্যসমূহ সুন্দররূপে সাধিত হইবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা মানবজাতির শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে নিজ নিজ কর্ম্মে দক্ষতাও প্রদান

করিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্য কার্য্যনিচয়ের মধ্যে পীড়িতের সেবা যত্নপূর্ব্বক উপযুক্ত-রূপে সম্পন্ন করা একটি প্রধান কার্য্য।

জীব দেহ ধারণ করিলেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু মানবগণ ব্যাধিরূপ শত্রুর দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইলেই তাহার প্রতীকার করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ পীড়ার উপযুক্ত চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইলেই রোগের যাতনা দূর হইতে পারে। বিশেষতঃ শুশ্রূষাই অধিক প্রয়োজনীয়। ইহা নিতান্ত গুরুতর কার্য্য। অনেক স্থলে উপযুক্ত শুশ্রূষা অভাবে সুচিকিৎসা সত্ত্বেও পীড়ার উপশম হয় না। এজন্য ইহা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি শিক্ষণীয়। আমাদের শরীর ও মনের এত নিকট সম্বন্ধ যে, একের উন্নতি ও অবনতিতে অপরের উন্নতি ও অবনতি হয়। এ নিমিত্ত এরূপে পরিচর্য্যা করা উচিত যে, রুগ্ন ব্যক্তির দেহ ও মন স্নিগ্ধ হইতে পারে। স্ত্রীলোকের শরীর কোমল ও মন স্নেহপ্রবণ, এই জন্য শুশ্রূষা কার্য্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের উপযোগিতা অধিক। তাই এ কার্য্যে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছি। শুশ্রূষাকারিণী নিজে সুস্থপ্রাণা, সবলকায়া, শ্রমদক্ষা, শান্তশীলা, সহিষ্ণুতা-পরায়ণা ও প্রফুল্লচিত্তা হইবেন; কারণ নিজের সুস্থতা ও সচ্ছন্দ না থাকিলে অপরের প্রাণে সুস্থতা ও সচ্ছন্দ আনিয়া দেওয়া দুরূহ।

রোগীর শুশ্রূষার প্রথম নিয়ম—বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতা। যে স্থলে পীড়িতকে রোগশয্যায় দিবস যামিনী একভাবে শয়ান অবস্থায় থাকিতে হইবে, উহা অতিশয় সুপরিষ্কৃত ভাবে রাখিতে হইবে—কোন প্রকার মলিনতা যেন তথায় জন্মিতে না পারে। শয্যা, ভূমি, পীড়িতের বস্ত্রাদি কোন প্রকারে আর্দ্র না থাকে। গৃহটীর অভ্যন্তরে যেন সুবায়ুর চলাচল থাকিতে পারে। বায়ুই মনুষ্যের জীবন রক্ষার প্রধান উপাদান। আমরা যতবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লই, কেবল বায়ু-ভক্ষণে শরীরে পুষ্টি লাভ করি, এজন্য অপরিষ্কৃত ও দূষিত বায়ু রোগীর পক্ষে কত অনিষ্টকারী, তাহা অনায়াসে বোধ-গম্য হয়। অপরিষ্কার বায়ুর দ্বারা শরীর দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। কোনরূপ দুর্গন্ধ বস্তু থাকিলেই তাহা বায়ু সহকারে রোগীর শরীরে প্রবেশ করিয়া যথেষ্ট ক্ষতি জন্মাইয়া দেয়। কিন্তু বাতাসের উপকারিতা বোধে, রোগীকে অপরিমিত বায়ুর মধ্যে অবস্থিত করান উচিত নহে, কেবল বাসস্থানের পরিচ্ছন্নতার নিমিত্ত যতটা আবশ্যক, উহাই লইতে হইবে। রোগীর শয্যা ঠিক্ শীতল বাতাসের সম্মুখে রক্ষা করিবে না, উহা দ্বারা শরীরের উত্তাপভাগ হ্রাস হইয়া যায়।

রোগীর শয্যা প্রতিদিন পরিবর্ত্তন করিবে। বস্ত্রাদির পরিচ্ছন্নতার প্রতি সাবধানে দৃষ্টি রাখিবে। সুপরিষ্কৃত, কোমল অথচ শরীরে শীত ও তাপ নিবারণ-যোগ্য বস্ত্র ব্যবহার করিবে।

ঘর্ম্মাক্ত দেহে কিম্বা ঘর্ম্মাক্ত বস্ত্রে এক নিমেষও রাখা বিধেয় নহে। ঘর্ম্ম শরীরের ক্লেদ; তাহা নির্গত হইয়া পুনরায় শরীরকে স্পর্শ করিলেই ক্ষতি হয়। যখন স্বেদ-জল মুছাইবে, অতি সাবধানে কোমল হস্তে সযত্নে মুছাইবে, যেন কোন রূপে রোগীর বেদনা বা কষ্ট না জন্মে। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের সময় সকল দ্বার জানালা রুদ্ধ করিয়া পরিবর্ত্তন করিবে এবং অতি সত্বরে এই কার্য্য সমাধা করিতে হইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম—রোগীর গৃহের নির্জনতা। পীড়িতের শয্যাপার্শ্বে অধিক লোকের সমাগম কষ্টদায়ক। অনেকের পদশব্দ, কথোপকথনের গোল, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্ষেপ—এ সমুদয়ই পীড়িতের পক্ষে অপকারী বই উপকারী নহে। সচরাচর আমাদের গৃহে রোগীর নিকট উহার অনেক বর্ষীয়সী আত্মীয়া উপস্থিত হইয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ, রোদন, তাহার পীড়ার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা যথাযথ বর্ণন ও সেইরূপ ব্যারামে কত জনের জীবনের শেষ হইয়াছে ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া ফেলেন। এই সকল মহা অনিষ্টকারী।

পীড়িতের নিকট অতি মৃদুস্বরে কথা কহা এবং ধীরে ধীরে গৃহে পদক্ষেপ করা আবশ্যক; যেন কোন রূপ কর্কশ শব্দে তাহার কষ্টবৃদ্ধি না হয়। অবসর মত যদি সে ইচ্ছা করে কিম্বা যখন নিদ্রার ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে, এমন অবস্থায় মনোহর উপাখ্যান পাঠে কিম্বা শ্রুতি-মধুর কথা বার্ত্তা কহিয়া ও সঙ্গীত করিয়া তাহাকে প্রফুল্লিত করা বিধেয়। রোগীর নিতান্ত আত্মীয় ও শুশ্রূষাকারিণী ছাড়া অন্যান্য লোকের বাহির হইতে তত্ত্বাবধান ও সংবাদ লওয়াই উচিত। রোগীর গৃহ সম্পূর্ণ সুস্থির ও নিস্তব্ধ থাকিবে।

পীড়িত ব্যক্তিকে এমন কোন কথা কহিবে না যদ্দ্বারা উহার অন্তঃকরণে কোন প্রকারে রাগ, দুঃখ, ভয় বা হঠাৎ অধিক আনন্দ জন্মিতে পারে। অনুক্ষণ অতি স্নেহ মমতা ভরে আলাপ করিবে। সর্ব্বদা একপ্রাণা হইয়া সমবেদনার সহিত পরিচর্য্যা করিয়া অসুস্থতা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

যখন ভয়ানক জ্বালায় গাত্রদাহ হইতেছে, বেদনায় প্রাণ অস্থির করিতেছে, তখন শুশ্রূষাকারিণী সুকোমল হস্তের মৃদু সঞ্চালনে তাহার সর্ব্বাঙ্গের ব্যথা ও জ্বালা দূর করিবেন। মাতা যেমন শিশু সন্তানের মুখের প্রতি প্রতিনিয়ত চাহিয়া অব্যক্তভাবেই তাহার সকল দুঃখের সম-ভাগিনী হইয়া তাহা দূর করিতে যত্নবতী হয়েন, সেই ভাবে রোগীর যখন যে যাতনা প্রবল হয়, উহা নিবারণে শুশ্রূষাকারিণী চেষ্টিত হইবেন। কিন্তু এমন আরামের উপায়—যাহা আশু কষ্ট-বিনাশক পরে অপকারী, তাহা কোন মতে অবলম্বন করিবেন না। রোগীর পক্ষে যখন যাহা উপকারজনক ও কষ্ট-নিবারক, ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া তাহাই করিতে হইবে।

তৃতীয়—পথ্য। ইহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য। পথ্যাভাবে অনেক পীড়িত অবিলম্বে

সবল হইতে পারে না, বরং দুর্ব্বলতা দ্বারা রোগ প্রবল হইয়া ঔষধের গুণ বিনাশ করত জীবনের হানি করিয়া ফেলে।

পথ্যের সময় ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত অর্থাৎ সবলতার জন্ত বারম্বার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করান চাই। নিষিদ্ধ কিম্বা অত্যাধিক পরিমাণে সময় উত্তীর্ণ হইয়া পথ্য গ্রহণ করা অপকারী। পথ্য লঘুপাক ও বলকারক হইবে। যে খাদ্য অনায়াসে পরিপাক না হইতে পারে কিম্বা উপযুক্ত পরিমাণে বলদায়ক না হয়, সে পথ্যে কোন উপকার নাই। অধিকাংশ স্থলে রোগীর রুচিজনক পথ্য দেওয়া চাই, অরুচিকর পথ্য গ্রহণে কে সম্মত হয়? কিন্তু তাই বলিয়া কোনরূপ কুপথ্য দিয়া পীড়িতকে সন্তুষ্ট করিবে না, তাহা হইলে কেবল রোগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইবে। চিকিৎসকের আজ্ঞানত স্বাদবিহীন সুপথ্য শ্রেষ্ঠতর।

পানীয় জল নির্ম্মল ও সুস্বাদযুক্ত হওয়া উচিত। উষ্ণ কিম্বা শীতল যেরূপ চিকিৎসকের ব্যবস্থা, সেইরূপ জল দিবে। কিন্তু তাহার মাত্রা অধিক করিতে বা একেবারে না দিয়া পিপাসার যাতনা দিতে নাই; উহা দ্বারা স্থলবিশেষে রোগেরও বৃদ্ধি ঘটে। যে কূপ অথবা পুষ্করিণীর জলে সর্ব্বদা বৃক্ষের পত্রাদি পড়িয়া থাকে কিম্বা কোনরূপ মল মূত্রাদির নালীর সহিত যোগ থাকে অথবা কোন সংক্রামক পীড়িত ব্যক্তির বস্ত্রাদির প্রক্ষালন হয়, সেখানকার জল অতি দূষিত। জল উষ্ণ করিয়া পরে শীতল করিয়া দিলে জলের দোষ কাটে। অতি পরিষ্কার পাত্রে স্বচ্ছ নির্ম্মল জল প্রয়োজন মতে দেওয়া উচিত।

আহারের সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা। ইহা দ্বারা অনেক গ্লানি দূর হয়; রোগীর চক্ষে যদি কোন মতে নিদ্রা আইসে, তন্নিমিত্ত তাহাকে ঘুম পাড়াইবার জন্ত পায় পায় হাত বুলাইয়া কোন মতে একটু আরাম জন্মাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

নিদ্রা দেবী সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী, ইহার ক্রোড়ে স্থান পাইলে রোগ শোক সকল অশান্তির বিরাম হয়।

চতুর্থ নিয়ম—ঔষধ সেবন। রোগ হইলে ঔষধ খাইতে হয়,ইহা সকলেই জানেন,কিন্ত সকল চিকিৎসকের প্রদত্ত সকল প্রকার ঔষধ্ উপকারজনক নহে। সুদক্ষ চিকিৎসকের হস্তে জীবন না রক্ষা হয়, তাহাও তত ক্ষোভের নহে; কিন্তু কুচিকিৎসকের হস্তে যাতনা ভোগ করা বড়ই শোচনীয়। বিশ্বাস-পাত্র সুচিকিৎসকের নিকট ঔষধ গ্রহণ আবশ্যক। চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবান্ না হইলে ঔষধের গুণাগুণ বোধ করিতে সক্ষম হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক শুশ্রূষাকারিণীর পক্ষে চিকিৎসকের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ যথাসময়ে যথাপরিমাণে যাহাতে সেবন হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। বিষাক্ত ঔষধ সকল বাছিয়া পৃথক্ রাখা উচিত। এ বিষয়ে বড়ই সতর্কতার প্রয়োজন। যে ঔষধ সেবনে যখন যেরূপ ফললাভ হয়, তাহাও লক্ষ্য করিয়া মনে রাখা এবং চিকিৎসককে বলা আবশ্যক।

চিকিৎসকের নিকট কোনও বিষয় গোপন রাখিবে না। রোগের বিবরণ আদ্যোপান্ত যথাযথ বর্ণন করিবে এবং অবিকল চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে চলিতে হইবে। অনেকে অবিলম্বে রোগমুক্ত হইবার ইচ্ছায় নানা প্রকার চিকিৎসা একত্র করাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও উপকারী না হইয়া অপকারী হয়। বৈদ্য ও চিকিৎসা সঙ্কটে হয়ত স্থলবিশেষে অমূল্য জীবন অলক্ষ্যে হারাইয়া ফেলিতে হয়, শুশ্রূষাকারিণীর সকল যত্ন ও পরিশ্রম বিফল হয়।

কোন কোন সময়ে অনেক কাল ঔষধ সেবন ও চিকিৎসা করিয়াও সুফল জন্মে না। তখন আমাদের উচিত উত্তম জল বায়ু-বিশিষ্ট স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করা। কিন্তু রোগীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাকে স্থানান্তরিত করা বিধেয়। উঠিতে বসিতে, যানারোহণে তাহার কিরূপ কষ্ট হইবে এবং সেই সামর্থ্যটুকু রোগীর আছে কি না, সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। আবার কোন্ রোগের কোন্ বিশেষ স্থানের জল বায়ু উপকার করে, এ সকল চিকিৎসকের মতসাপেক্ষ। সর্ব্বত্র সমভাবে রোগীর প্রধান প্রয়োজন শুশ্রূষা। চিকিৎসকের অপেক্ষা শুশ্রূষার দায়িত্ব গুরুতর ও অধিক কষ্টসাধ্য। উপযুক্ত শুশ্রূষা-গুণে দুশ্চিকিৎস্য পীড়া আরোগ্য হয় এবং তাহার অভাব বশতঃ সামান্য রোগ প্রবল হইয়া জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

রোগীর শুশ্রূষা করা অতি কঠিন কার্য্য। দিবা নিশি অবিরাম আহার-নিদ্রা-বর্জিত-প্রায় হইয়া পীড়িতের নিকট থাকিয়া পরিচর্য্যা না করিলে আশানুরূপ ফল লাভ হয় না। এজন্য জগতে যত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে পীড়াক্লিষ্ট ব্যক্তির সুস্থতা দানের চেষ্টা করা অতি প্রধান। যত পুণ্য কর্ম্ম লোকে করিয়া থাকে, পরে তাহার ফল লাভ করিবার আশায়, কিন্তু পীড়িতের শুশ্রূষার ফল হাতে হাতে লাভ হয়। যে মুহূর্ত্তে পীড়িত ব্যক্তির রোগের উপশম বা অবসান হয়, সেই মুহূর্ত্তেই শুশ্রূষাকারিণীর কঠিন পরিশ্রম সার্থক হয় এবং তাহার প্রাণে স্বর্গের সুখ আনিয়া দেয়। আর রোগীর সহিত সমব্যথী হইতে ও অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইতে পারিলে হৃদয়ে নির্ম্মল আনন্দ লাভ হয়। পুণ্যের পুরস্কার সুখেও হয়, দুঃখেও হয়।

কত ইয়ুরোপীয় ভদ্র ও কৃতবিদ্য মহিলা রোগীর শুশ্রূষার্থে নিজ গৃহ ও সংসারের সুখ সচ্ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া দেশ দেশান্তরে গিয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। পীড়িতবর্গের আবাসভূমি ও চিকিৎসালয়ে সর্ব্বত্র রোগিগণ তাঁহাদের আত্মীয় জনের সমান। অবিশ্রান্ত জননীর মত স্নেহ মমতায় পূর্ণ হইয়া তাঁহারা পর-সেবায় নিযুক্ত।

এই মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠানের উপযোগী শিক্ষা লাভ করা আমাদের প্রত্যেকের

কর্ত্তব্য। তাহা হইলে কি গৃহে কি অপর স্থানে বঙ্গনারীগণ রোগীর শুশ্রূষা-রূপ পুণ্য কার্য্য করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিবেন। শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

বিদ্যুৎ ও তাহা ধরিবার উপায়।

প্রাচীনকালের অজ্ঞান লোকদিগের নিকটে বিদ্যুৎ একটী নিতান্ত অপরিচিত পদার্থ ছিল। ইহা কোথা হইতে আইসে, কোথায় চলিয়া যায়, তাহারা ইহার তত্ত্ব কিছুই জানিত না। ইহা ক্ষণিক, আকস্মিক ও অতি দূরস্থ কোনও বস্তু বলিয়া তাহাদের ধারণা ছিল; ইহাকে তাহারা ক্ষণপ্রভা বলিত। ইহার প্রকাশ দেখিয়া তাহারা চমকিত ও ভীত হইত। বিদ্যুৎ আপনা আপনি সুদূর আকাশ হইতে হঠাৎ দীপ্যমান হইয়া অন্ধকারময় পৃথিবী ও আকাশকে আলোকিত করিত, আবার তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া চক্ষু ধাঁধিয়া ফেলিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর মেঘ-গর্জ্জন ও অশনিপাত হইয়া ত্রিভুবনকে কম্পান্বিত করিয়া তুলিত। বিদ্যুৎ কি অজ্ঞাত নিগূঢ় পদার্থ! কি ভয়ঙ্কর!!!

মানবের জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যত বিজ্ঞানচর্চ্চা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই এই আশ্চর্য্য বিদ্যুৎ পদার্থের তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। কোনও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সূত্রযোগে ইহাকে নভোমণ্ডল হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ করিবার কৌশল বাহির করিলেন। কেহ এই চঞ্চলা চপলাকে যন্ত্রবিশেষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া সুস্থির করিলেন; কেহ ইহাকে বার্ত্তাবহ দাসরূপে আপনার কার্য্যসাধনার্থ নিযুক্ত করিলেন। দূরস্থ বিদ্যুৎ নিকটস্থ হইল। ক্ষণপ্রভা স্থির সৌদামিনীরূপে দীপাধারে উপবিষ্ট হইয়া চারিদিকে জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। বিজ্ঞানের গভীর গবেষণাতে প্রকাশিত হইল যে, বিদ্যুৎ কেবল আকাশবিহারী একটী বস্তু নহে, কিন্তু ইহা সমুদায় বিশ্বসংসারব্যাপী। এই পৃথিবীর অণুতে অণুতে ইহা বিদ্যমান, আমাদের শরীরের পরমাণুতে পরমাণুতে ইহার অধিষ্ঠান। এখন বিদ্যুৎপ্রভাবে গৃহ ও নগর আলোকিত হইতেছে, ইহার শক্তি দ্বারা সহস্র সহস্র যন্ত্র পরিচালিত হইতেছে। যে কার্য্য জল, বায়ু, অগ্নি, বাষ্প প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের স্বতন্ত্র বা সমবেত শক্তির অতীত ছিল, এই অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তিতে তাহা অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ ইহা মানবসংসারে অসাধ্য সাধন করিতেছে। ইহা দ্বারা যে আরও কত অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাহা এখন আমরা কল্পনাতেও স্থির করিতে পারি না। বিদ্যুতের গূঢ়তত্ত্ব আজিও বৈজ্ঞানিকের সম্পূর্ণ অগোচর।

আমাদের প্রাচীন ঋষিরা ঈশ্বরকে 'বিদ্যুৎপুরুষ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিদ্যুতের ইতিহাসের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানের ইতিহাসের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। প্রাচীন, অসভ্য, অজ্ঞান মানবের নিকটে পরব্রহ্ম অতি দূরস্থ বস্তু ছিলেন। তাহারা মনে করিত, কোন আকাশে বা স্বর্গে তিনি বসতি করেন। তিনি অতি অজ্ঞেয় বস্তু, ক্ষণকালের জন্য যদি কখনও প্রকাশিত হন, সে কেবল মানবকে চমকিত ও ভীত করিবার জন্য। তিনি "মহদ্ভয়ম্ বজ্রমুদ্যতম্।" তিনি পাপীকে শাসন করিবার জন্য বিকট ভ্রূকুটি এবং ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ করিয়া থাকেন।

অনভিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে ঈশ্বরের স্বরূপ ও কার্য্যের কত ভীষণ ও বিকৃত কল্পনা! কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে মানবের সংস্কারের কত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। যে অদৃশ্য নিরাকার পরমেশ্বর দূরস্থ আকাশের অন্তরালে থাকিয়া মানবকে কেবল আশ্চর্য্য ও ভীত করিতেন, মানব ক্রমে তাঁহাকে নিকট হইতে নিকটতর করিয়া দেখিতে লাগিল। সেই দেবতাকে "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু, যো বিশ্বভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।"

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে, সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার—এই বলিয়া উপাসক দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ঊর্দ্ধ, অধঃ সকল দিকে তাঁহার চরণে অবনত হইয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তিনি সমুদ্রতরঙ্গে, নদীর লহরীতে, পর্ব্বতের তুষার-ধবলশৃঙ্গে, বায়ুহিল্লোলে, পুষ্পকাননে, প্রকৃতির বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। ক্রমে দেখিলেন যে, এই জড়জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে সত্তার সত্তা হইয়া তিনি বিদ্যমানঃ—"প্রাণোহ্যেষঃ যঃ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি" ইনিই সকলের প্রাণস্বরূপ যিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকগণ ক্রমে তাঁহাকে চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। সেই দূরস্থ অজ্ঞেয় পরব্রহ্মকে আত্মস্থ করিয়া তাঁহারা দিব্য আলোকে আলোকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—কি অদ্ভুত জ্যোতি!

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"

ঋষি বলিলেন সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও পারে না, বিদ্যুৎসকলও পারে না, তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কি প্রকারে প্রকাশ করিবে? "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্ তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তাঁহারই প্রকাশে এই বিশ্বসংসার অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এইরূপে সেই

ভরের বস্তু জগতের শাসনকর্ত্তা ও পাপীর ত্রাতা পরমেশ্বরকে "সত্যং শিবং সুন্দরং" রূপে—হৃদয়াকাশের প্রেমচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রেমে উন্মত্ত ও বিহ্বল হইতে লাগিলেন। নিজ জীবনের ও মানবসমাজের ঘটনা সকলের মধ্যে তাঁহারই মঙ্গলহস্ত দর্শন করিয়া তাঁহারই চরণে প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন "In Him we live and move and have our being"—আমরা তাঁহার মধ্যে বাঁচিয়া আছি, বিচরণ করিতেছি এবং জীবন ধারণ করিতেছি। ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মসাধকের অন্তর বাহির উজ্জ্বল। ব্রহ্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি অদ্ভুত কার্য্য সাধনে সমর্থ। এই দিব্য আলোকে কোন্ অন্ধকার না দূর হয়? এই দৈব- শক্তিতে কোন্ অসম্ভব কার্য্য সম্ভবপর হইতে না পারে?

অধরা বিদ্যুৎ ধরা পড়ে বিজ্ঞান-কৌশলে। বৈজ্ঞানিক কঠিন ধাতুময় পাত্রে এক প্রকার দ্রাবক ঢালিয়া বিদ্যুৎ পদার্থ অভ্যুদিত করেন এবং সূক্ষ্ম তার-যোগে তাহা হইতে আলোক ও শক্তির বিচিত্র কার্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এক একটী সামান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা অশেষ প্রকার অদ্ভুতকার্য্য সম্পন্ন হয়। মানবের হৃদয়পাত্র যখন বিশ্বাসে দৃঢ় হয় এবং তাহাতে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়, তখন অগম্য অপার ব্রহ্ম সেইখানে ধরা পড়েন। তিনি বিশ্বাসীর জীবন্ত বর্ত্তমান দেবতা, তিনি ভক্তাধীন ভগবান্! বিশ্বাস এবং ভক্তিযোগে মানব সেই অরূপী ঈশ্বরের দর্শন পায়। তাঁহার সহিত আত্মার যোগ স্থাপন করিয়া জ্ঞানেতে, প্রেমেতে, পুণ্যেতে, আনন্দেতে পরিপূর্ণ হয়। যত দৃঢ়তর বিশ্বাস, যত গভীরতর প্রেম, মানবাত্মা ততই পবিত্র হইতে পবিত্রতর আলোকে উজ্জ্বল হয় এবং ঐশী শক্তি অন্তরে লাভ করিয়া অলৌকিক কার্য্য সাধনে সক্ষম হয়। ব্রহ্ম অক্ষয় জলধি, আত্মা নদী তাঁহার সংযোগে চির দিন পরিপুষ্ট হইয়া অনন্তের দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই যোগ অধ্যাত্ম যোগ—এই ব্রহ্মযোগে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥"

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন "হে পার্থ! এই পরব্রহ্মে আত্মার স্থিতি ব্রাহ্মী স্থিতি, এ যোগ এক বার লাভ করিলে আর মোহাচ্ছন্ন হইতে হয় না, অন্তকালেও এই যোগে স্থিতি করিতে পারিলে জীব ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

পল্লীগ্রামে গৃহচিকিৎসা।

১। কাউর ঘা।

আমরা শত শত স্থলে দেখিয়াছি, যদি কোন ব্যক্তির পায়ে কিম্বা হাতে কাউরের ঘা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই ঔষধ যথাবিধি লাগাইলে, অর্থাৎ তিন দিবস ব্যবহার করিলে ঐ ঘা একেবারেই ভাল হইয়া যায়। চৈত্রমাস পড়িবার সময় যে সংক্রান্তি হয়, ইহাকে আমাদের দেশে ঘেঁটু-সংক্রান্তি বলে। ঐ সংক্রান্তি দিবসে যে ঘেঁটুফুল বা ভাঁট ফুল দিয়া ঘেঁটু-পূজা করা হয়, সেই ঘেঁটু গাছের পাতা কতকগুলি আর এক তোলা আন্দাজ সোমরাজ একত্র করিয়া হুঁকার জল দিয়া শিলে বাটিয়া গরম করিতে হয়, এবং সামান্য গরম থাকিতে থাকিতে ঘায়ে লাগাইতে হয়। ইহা দিবসে দুইবার ব্যবহার করিতে হয়। এই নিয়মে তিন দিবস ব্যবহার করিলেই নিশ্চয় রোগের শান্তি হইবে।

২। গাল ফোলার মহৌষধ।

সচরাচর জল ব্যবহার করিয়া যদি গালে ব্যথা হয়, কিম্বা যিনি সতত সাবধানে থাকেন এমন ব্যক্তির যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া গালে ব্যথা হইয়া থাকে, ইহার ঔষধের ব্যবস্থা এইরূপ আছে,—দারুচিনি কিঞ্চিৎ পরিমাণে জল দিয়া বাটিয়া ঐ ব্যথার জায়গায় লাগাইতে হয়। লাগান হইলেই একবার রৌদ্রের উত্তাপে গাল পাতিয়া স্থির হইয়া থাকিতে হয়। এই মত এক দিন করিলেই রোগের শান্তি হয়। গালে ব্যথার আর একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে। আমাদের দেশে যে শ্বেত করবী ফুল ফুটিয়া থাকে, ঐ ফুল গাছের শিকড় আর কাঁই বীচি অর্থাৎ পাকা তেঁতুলের বীজ হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া গরম করিয়া ব্যথায় লাগাইলে এক দিবসেই রোগের অবসান হইয়া যায়।

৩। আর্শুলা চাটা ঘার মহৌষধ।

মুখে কিম্বা মস্তকে অথবা গাত্রের কোন স্থানে যদি ঘা হইয়া থাকে, সেই ঘা দৈবক্রমে আর্শুলায় চাটিলে ঘা বড় বিপরীত হইয়া থাকে। আর্শুলায় চাটিয়াছে, কিম্বা না চাটিয়াছে, ইহা জানিবার একটি নিয়ম এইরূপ আছে। যে ঘা গুলি আর্শুলায় চাটিয়া থাকে, সেই ঘায়ের ধারে ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজ-কুড়ী বিজকুড়ী বাহির হয়, আর রস বাহির হইতে থাকে। খুব রস বাহির হয় না, অথচ অল্প পরিমাণে সর্ব্বদাই বাহির হইতে দেখা যায়। এই ঘা আরোগ্য হইবার এই একটি বিশেষ ঔষধ বাহির হইয়াছে। তেঁতুল পাতা আর কুমীরে পোকার ঘর অর্থাৎ সেই ঘরের মাটীগুলি তেঁতুল পাতার সহিত মিশাইয়া হুঁকার জল দিয়া বাটিয়া গরম করিয়া

ঘায়ে লাগাইতে হয়। ইহা দুই দিবস ব্যবহার করিলেই রোগের শেষ বুঝিতে পারা যায়।

৪। কচিছেলের গা-বালসান।

কচিছেলের গা বাল্‌সাইলে আমাদের দেশে সেই ছেলের প্রতি প্রথমতঃ এইরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। শনিবার কিম্বা মঙ্গলবার বাদ দিয়া যে কোন বারেই হউক ছেলেকে এক চামচ, আন্দাজ উচ্ছেপাতার স্বত্ব কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হয়, কিম্বা এক বড় মটর কলাই প্রমাণ আলুই বড়ী প্রসূতির স্তনদুগ্ধে ভিজাইয়া এক চামচ, আন্দাজ ছেলেকে খাওয়ান হয়, ইহা করিলে ছেলে বাহ্যে ও বমী করিয়া কতক সুস্থ হয়। পরে এক কোষা রসুনকে ছাড়াইয়া সূতাতে বান্ধিয়া ছেলের গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।*

৫। নবজ্বরের মহৌষধ।

আমাদের দেশে যদি কাহারও নবজ্বর হয়, তাহা হইলে অগ্রেই ডাক্তার দেখান হয় না, বাটীর গৃহিণীরা অগ্রেই নানামত গৃহচিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া, লতা পাতা ইত্যাদি আনিয়া ঔষধ তৈয়ার করিয়া খাওয়াইয়া দেন। এই গাছ গাছড়ার ঔষধ যদি কাহারও আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তিনি এই সকল লইয়া ঔষধ তৈয়ার করিতে পারিবেন। হঠাৎ যদি কাহারও নবজ্বর হয়, তাহা হইলে ঐ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই ঔষধ খাওয়ান হয়। এক ছটাক আন্দাজ বিল্বপত্রের স্বত্ব (ইহাতে জল যেন না থাকে), আর এক তোলা আন্দাজ মুথাঃ ঘাসের স্বত্ব, এবং একটা হরিতকীর ছাল, ও স্বল্প পরিমাণ জুয়ান, এই কয়টি দ্রব্য একত্রে বাটিয়া ঐ বিল্বপত্রের স্বত্ব ও মুথা ঘাসের স্বত্বের সহিত মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইতে হয়। আর যদি রোগীর তলপেটে ব্যথা থাকে, তাহা হইলে মাতাঘসার সঙ্গে যে আমলা থাকে, সেই আমলাকে কাঁচা দুগ্ধের সহিত শিলে বাটিয়া গরম করিয়া নাভিস্থলের চারি ধারে চাপন দিতে হয়, ইহা হইলে পেট ব্যথার যাতনা অবিলম্বেই আরোগ্য

---

* পাড়াগাঁর মেয়েরা ছেলের বালসা হইলে যে ঝাড়ার মন্ত্র ব্যবহার করেন, তাহা পাঠিকাগণের গোচরার্থ প্রকাশ করা যাইতেছে, যাঁহার শ্রদ্ধা হয় ইহা ব্যবহার করিতে পারেন। মন্ত্রের গুণ হউক না হউক, ঝাড়নের গুণে অনেক পীড়ার আরাম হয়।

বালসা ঝাড়া।

সাজ বালসা সাজ লক্ষী,
কেন বালসা এত রাতি,
পো হাসে পুয়াতী হাসে,
সাজ বালসা ধুলায় নাশে,
বাউর থেকে এলো বুড়ী,
হাতে লইয়া রসের ডালী,
এ রসের নাম কি—স্বরূপ
এ রস থাকে কোথা?
সাত সমুদ্র লঙ্কাপারে,
আমাদের কচী খোকার
গাত্র হইতে এক্ষণি যা,
এক্ষণি যা, এক্ষণি যা।

এই বাক্যটি তিনবার বলিতে হয়।

হয়। আর যদি গায়ের খুব ব্যথা থাকে অর্থাৎ গা সমস্ত টাটাইয়া উঠে, তাহা হইলে খুঁদে মেথি ভাজিয়া এক মুষ্টি চাউল ভাজার সঙ্গে মিশাইয়া চিবাইয়া খাইতে হয়। ইহা হইলে অচিরে গায়ের ব্যথা আরাম হয়।

৬। রক্ত আমাশয়ের মহৌষধ।

যদি কাহারও রক্ত আমাশয় হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে এই গৃহ-ঔষধ ব্যবহার করা হয়। কদবেলের পাতা, আর তেঁতুল পাতা, থুনকুড়ী ও ভুঁই-কামড়ী ও বাবলা গাছের কুঁড়ী এইগুলি একত্রিত করিয়া শিলে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জলের সহিত বাটিয়া উহার রস বাহির করিয়া প্রাতঃকালে দিবসে একবার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ইহা এক সপ্তাহ ব্যবহার করিলেই রোগের অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই রোগে আরও একটি ঔষধ ব্যবহৃত হয়, ইহাও প্রসিদ্ধ ঔষধ। শনিবার কিম্বা মঙ্গলবারে এই ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই। বুধবার বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার, এই তিন দিবস ব্যবহার করা যায়। প্রাতে শয্যা হইতে যখন ওঠা হয়, তখন মুখ না ধুইয়া অর্থাৎ বাসি মুখে কতকগুলি তেলাকুচার পাতা আনিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিয়া হাতে করিয়া রগড়াইয়া এক তোলা আন্দাজ স্বত্ব বাহির করিয়া প্রথমতঃ রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। তৎপরে ঐ স্বত্ব বাহির করিয়া যে তেলাকুচা পাতার সিটেগুলি থাকিবে, সেইগুলি হাতে করিয়া লইয়া বৃদ্ধ অঙ্গুলির টীপন দিয়া কিঞ্চিৎ স্বত্ব বাহির করিয়া অর্থাৎ ঐ স্বত্ব ঐ বৃদ্ধ অঙ্গুলি করিয়া লইয়া রোগীর অষ্টাঙ্গে আট ফোঁটা দিয়া অর্থাৎ মস্তকে, দুই স্কন্ধদেশে, বক্ষে ও দুই কর্ণে ও পৃষ্ঠদেশে দিয়া পরে অন্তরে ফেলিয়া দিতে হয়। এই মত নিয়ম তিন দিবস করিলেই রোগের উপশম হয়।

(ক্রমশঃ)।

ত্রিকূট পশু।

সারমেয়, শার্দ্দূল ও মার্জ্জার এই ত্রিবিধ জন্তুর জন্ম, মৃত্যু, বুদ্ধি ও প্রকৃতি প্রায় একই প্রকার; এই জন্য প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে কুকুর, বিড়াল ও ব্যাঘ্র 'ত্রিকূট' পশু নামে অভিহিত হইয়াছে। ইংরাজি ভাষায় ঠিক্ এইরূপ অর্থব্যঞ্জক কোনও শব্দ নাই বটে, কিন্তু ইংলণ্ডীয় প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা "Feline species" শ্রেণীর মধ্যে বিড়াল ও ব্যাঘ্রকে সন্নিবিষ্ট করিয়া উভয়ের প্রকৃতির একতা দেখাইয়াছেন। তাঁহারা আরও একটু সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইতেন যে, কয়েকটী সামান্য বিষয় ভিন্ন এই তিনটি জন্তু প্রায় একই প্রকার প্রকৃতির

পশু। ব্যাঘ্রাদি ভয়াল হিংস্র শ্বাপদ সমূহ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু বোধ হয় এমন দিনই নাই যে দিন অন্ততঃ আমরা একটিও কুকুর বা বিড়াল দেখিতে না পাই। ইহাদিগকে "গৃহপালিত" বা "গ্রাম্য পশু" বলা যাইতে পারে; গৃহস্থের সহিত পৃথিবীর আর কোনও পশুর এত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নাই; সুতরাং ইহাদের প্রকৃতি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। অনেক সময়ে ইহারা আমাদের প্রভূত উপকার ও ব্যবহারে আইসে এবং অতি শীঘ্র বশ্যতা স্বীকার করে। একবার পালিত বা পোষিত হইলে ইহারা প্রভুর নিতান্ত অনুগত হয় এবং অসাধারণ প্রভুভক্তি, স্বার্থত্যাগ, আনুগত্য, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সদৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এই জন্য অনেক বুদ্ধিমান ধনী পুরুষ আপনাপন বালক বালিকাকে পোষিত কুকুর ও বিড়ালের সহিত খেলা করিতে দেয়।

জর্ম্মণির উদ্ভিদ্‌মাত্রভোজী পণ্ডিতেরা সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ অথবা আফ্রিকার ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান প্রদেশে কুকুর বা বিড়ালকে শিশুকাল হইতে মৎস্য বা মাংস খাইতে না দিলে এবং যাবজ্জীবন নিরামিষাশী করিয়া রাখিলে অথবা মাসে একবার কিম্বা দুইবার মাত্র মাংস খাইতে দিলে তাহাদের স্বাস্থ্য বা শক্তির হানি হয় না। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরা এই মতের সারবত্তা স্বীকার করিয়াছেন। গেল্‌লার নামক একজন পশুপ্রিয় সাহেব লিখিয়াছেন "আমার একটি প্রিয় সারমেয়কে প্রথমে আমি তিন মাস কাল প্রতি সপ্তাহে দুইবার মাত্র মাংস দিতাম, তদনন্তর প্রতি মাসে দুইবার এবং তাহার পরে এক মাস অন্তর একবার করিয়া আমিষ দেওয়া হইত। কিছুদিন পরে উহাকে আদৌ আমিষ দেওয়া হইত না, এজন্য তাহার দুর্ব্বলতা বা ভীরুতা লক্ষিত হয় নাই। আমার আর একটি কুকুরকে কখনই মাংস খাইতে দিই নাই; এই কুকুর বলবান্ ও সাহসী হইয়াছিল, কিন্তু কি কারণবশতঃ বলিতে পারি না অধিক দিন বাঁচে নাই। বোধ হয়, গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইলে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিত।" যাহাই হউক, যে দেশে সূর্য্যের রশ্মি প্রখর, সে দেশের অধিবাসীদিগকে যেমন মৎস্য, মাংস বা সুরার আধিপত্য স্বীকার করিতে হয় না, সেইরূপ সে দেশের কুকুর বা বিড়ালেরা আমিষ পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে অক্ষম হয় না; কিন্তু ব্যাঘ্রাদি পশুর পক্ষে এ কথা খাটে কিনা, সন্দেহস্থল। প্রবাদ আছে লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহ একটি ব্যাঘ্র-শিশুকে নিরামিষাশী করিয়া নয় মাস পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ব্যাঘ্রী, বিড়ালী ও কুকুরী গর্ভবতী হইলে ভয়ানক আকার ধারণ করে, তখন তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া থাকে। এই সময়ে ইহারা কাহাকে দংশন করিলে অথবা কাহারও গাত্রে নখ বা দন্ত বসাইয়া দিলে

সর্ব্ব শরীর বিষাক্ত হয়। এই তিন প্রকার জন্তুর কপোলে এবং নাসিকারন্ধ্রের পার্শ্বে লম্বা লম্বা ও অল্প অল্প যে লোম জন্মে, তাহা নিতান্ত বিপজ্জনক। এই লোম সকল বিষে পূর্ণ। দুগ্ধ বা খাদ্য দ্রব্যের সহিত তাহা মিশ্রিত হইয়া যদি ভোক্তার উদরে যায়, তাহা হইলে গলা হইতে পেট পর্য্যন্ত পীড়িত হইয়া থাকে। প্রাচীন বৈদ্য-গ্রন্থেও এ কথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং যে যে স্থানে ব্যাঘ্রের ও কুকুর বিড়ালের সংখ্যা অধিক, সেই সেই স্থানের লোকেরা এই জন্য বিশেষ সাবধানে থাকে। মনুষ্যের মস্তকের কেশও ভাল জিনিষ নহে। গলার ভিতরে প্রবেশ করিলে গলার স্থানে স্থানে বেদনা অনুভূত হয় এবং পাক-শক্তির হীনতা উৎপাদন করে অথচ একবার প্রবেশ করিলে শীঘ্র নির্গত হয় না।

একটি বিষাক্ত সর্প আর একটি বিষাক্ত সর্প দ্বারা দংশিত হইলে যেমন মৃত্যুগ্রাসে পতিত অথবা পীড়িত হয় না, কুকুর বা বিড়ালদিগের মধ্যে তাহা নহে। একটি কুকুর আর একটী কুকুর কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া পীড়িত অথবা মৃত হইয়াছে, ইহা আমরা অনেকবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, কুকুর ও বিড়াল জাতীয় পশুদিগের মধ্যে সকলের বিষ সমান নহে; বিষের তীব্রতা ও লঘুতা ইহার কারণ। কিন্তু কুকুর বা বিড়াল ভয়ানক বিষাক্ত অহি কর্ত্তৃক দংশিত হইলেও মরে না বা পীড়াগ্রস্ত হয় না। কাশীপুর রাসায়নিক কারখানার অধ্যক্ষ (কেমিকেল ওয়ার্কস্) শ্রীযুক্ত ডেবিড ওয়াল্‌ডি সাহেব গভীর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ব্যাঘ্র, কুকুর, বিড়াল, সর্প এবং নেউল এই কয়েকটি পশুর শরীরের প্রধান প্রধান অংশসমূহ এক প্রকার জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে, তাহা বিষঘ্ন, সুতরাং বিষে জর্জ্জরিত হয় না। এ কথা কতদূর ঠিক্ বলিতে পারি না; কিন্তু কুচলা খাওয়াইয়া অনেক কুকুরকে বেদিয়া ও ব্যাধেরা মারিয়াছে, ইহা চক্ষে দেখিয়াছি। উক্ত সাহেবের মতে হনুমান, মনুষ্য, গবাদি প্রাণীর শরীরে সর্প বিষের টীকা দিয়া যদি তাহা-দিগকে কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাঁচাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহারা বিষে মরে না। আমরা এতদূর বৈজ্ঞানিক হই নাই যে,ইহার সত্যাসত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখি। যাহাহউক, খাদ্য-দ্রব্যে বিড়াল বা কুকুরের মুখের লালা যাহাতে মিশ্রিত না হয়, প্রতি গৃহস্থের তাহাতে সাবধান থাকা উচিত। অনেক সময়ে কুকুর ও বিড়ালে সর্প খাইয়া থাকে এবং মুখে মৃত সর্প অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাখে। স্ত্রীলোকদিগের এই কথাটি যেন মনে থাকে। প্রাচীন শাস্ত্রে এই জন্য কুকুর ও বিড়াল কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট খাদ্যাদি ভক্ষণ বা গ্রহণের নিষেধ ও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যদি কোনও সময়ে কোনও পুরুষ বা স্ত্রীলোক এইরূপ খাদ্য খাইয়া পীড়িত হয়েন এবং তাহা স্পষ্টতঃ জানিতে পারেন, তাহা

হইলে তিনি যেন তদ্দণ্ডে বাধা ভেরেণ্ডা (এরণ্ড) গাছের কিয়দংশ মূল অতি পুরাতন ইক্ষু গুড় বা পুরাতন ঘৃতের সহিত বাটিয়া ভক্ষণ করেন, এবং দুই তিন দিন পর্য্যন্ত শাক ও অম্ল এবং মিষ্টান্ন ভক্ষণ না করেন। ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠ ঔষধ। কিছুদিন বিলম্বে পীড়ার কারণ জানিতে পারিলে, অপামার্গ (আপাং) গাছের মূল (অর্দ্ধ তোলা) পাঁচটি গোলমরিচের সহিত বাটিয়া খাইবেন। ঐ দিবস তিন চারি বার স্নান এবং শীতল বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য, নতুবা শরীর ও মস্তিক অত্যন্ত গরম হয়। ইহাও অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ রোগে পুনঃপুনঃ স্নান এবং কাঁজি বা আমানি পান ও লেবুর সরবৎ বা লেমনডের ব্যবস্থা করিতেন।

বিড়াল অপেক্ষা কুকুরের প্রভুভক্তি প্রসিদ্ধ। মূষিক, সর্প প্রভৃতি নিবারণ পক্ষে মার্জ্জার বড় উপকারী। কিন্তু বহির্দ্দেশের শান্তিরক্ষা-হেতু কুকুর অপেক্ষা আর কোনও জন্তুই অধিকতর উপকারী নহে। কুকুরের স্মরণশক্তি বিড়ালের অপেক্ষা অধিক, কিন্তু দ্রুতগতি ও পরিশ্রমপরায়ণতায় সারমেয় অপেক্ষা মার্জ্জার অধিকতর পটু। পালিত কুকুর ও বিড়াল অল্প আহারেই সন্তুষ্ট হয়, অপালিত পশু সেরূপ নহে। কুকুর ও বিড়াল সম্বন্ধে অনেক গুরুতর, প্রয়োজনীয়, এবং কৌতুককর নূতন কথা জানিবার আছে; পাঠিকাদিগের তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার উপনগর ইটালির কৈলাসচন্দ্র-হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ে বঙ্গের ছোট লাট উপস্থিত হইয়া বালিকাদিগকে স্বহস্তে পুরস্কার বিতরণ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয় ২৩ বৎসর চলিতেছে। গত ছয় বৎসরে ৬৫টী বালিকা নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে ২৯টী বৃত্তি পাইয়াছে।

২। গত ৯ই এপ্রেল রাজবাড়ী হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত রেল খুলিয়াছে।

৩। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত স্যার মনিয়ার উইলিয়মসের মৃত্যু হইয়াছে।

৪। গত ৯ই এপ্রেল রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় দার্জ্জিলিংএ ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। কম্পন প্রায় একমিনিট ছিল।

৫। গত ১লা এপ্রেল পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে কলিকাতায় মৃত্যুসংখ্যা এ বৎসর ৫২০, গত বৎসর ২৮৩ মাত্র হইয়াছিল। প্লেগে প্রায় ১০০ শত লোক মরিয়াছে।

৬। গত ৮ই এপ্রেল রাত্রি ১০ দশটার পর দিল্লী অঞ্চলে প্রকাণ্ড দ্বাদশটী উল্কাপাত হয়।

৭। বড় লাট লর্ড কুর্জ্জন শিমলা দর্শনে বড়ই সুখী হইয়াছেন। তিনি আশা করেন এই শান্তিময় স্থলে গুরুতর রাজ কার্য্য সকল সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

৮। রুষিয়ার ভল্গা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

৯। গত ২১ মার্চ্চ শ্রীহট্ট অঞ্চলে ৬ ঘণ্টার মধ্যে ৭ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। অনেক বাড়ী ফাটিয়া গিয়াছে।

১০। গত ১৫ই চৈত্র ফরিদপুরে যে ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছে, তাহাতে ১০।১২টি গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার গৃহ চূর্ণ হইয়াছে। ছোট বৃক্ষাদি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে, একস্থানে লৌহ শৃঙ্খলবদ্ধ ৬।৭ মণ ওজনের লোহার সিন্দুক ২৫।৩০ হাত দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ১৩।১৪ জন লোক মরিয়াছে, অসংখ্য গৃহপালিত পশু মারা গিয়াছে।

১১। ইহুদিদিগের আদিম বাসস্থান প্যালেষ্টাইনে বর্ত্তমান ইহুদিসংখ্যা এক-লক্ষ। ইহুদিরা প্রবাস হইতে বোধ হয় স্বদেশে ফিরিতে অনুরাগী হইয়াছে।

১২। গত ২৪এ মার্চ্চ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট হলে অনাথ আশ্রমের বার্ষিক সভায় ছোটলাট সভাপতিত্ব করেন। আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থ রায় মন্মথনাথ মিত্র ১০ হাজার এবং অন্যান্য মহাত্মাগণের দান সভাস্থলে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।

১৩। সেনাপতি গর্ডনের স্মরণার্থ তাহার বীরস্থান খার্টুমে যে কলেজ হইতেছে, বিলাতের লোক এ পর্য্যন্ত তাহার ফণ্ডে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১৪। কন্ষ্টাণ্টিনোপলে রেজোয়ান বাবা নামক মুসলমান ১৩৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহার পত্নী আয়েসা সিদ্দিকার ১০০ বৎসরে মৃত্যু হয়। উভয়েই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল ছিলেন।—সুধাকর।

পুস্তক-সমালোচনা।

কেনিলওয়ার্থ—শ্রীশরৎ চন্দ্র মিত্র প্রণীত, মূল্য ২।০ টাকা। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী উপন্যাসলেখক স্যর ওয়াল্টার স্কটের প্রণীত "কেনিলওয়ার্থ" বঙ্গীয় পরিচ্ছদে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ভাষান্তর কার্য্য এরূপ সুনিপুণরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন যে, ইহা মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া ভ্রম হয়। বস্তুতঃ ইংরাজী নাম সকল না থাকিলে ইহা যে ইংরাজী হইতে গৃহীত, তাহা কোনও মতেই প্রতীত হইত না। ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, সেইরূপ সরল ও যথাযথ ভাবব্যঞ্জক হইয়াছে

এবং বর্ণনাগুলি অতি সুন্দর সুচিত্রিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিতে যিনি আরম্ভ করিবেন, শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না। নবীন লেখকের এই লিপিনৈপুণ্যের জন্য আমরা তাঁহাকে সহস্র সহস্রে ধন্যবাদ করি এবং আশা করি সাহিত্যক্ষেত্রে ইনি অচিরে সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবেন। ইঁহার গুণের সমুচিত সমাদর হওয়া আবশ্যক। কেনিলওয়ার্থের গল্পটী অভিনয়োপযোগী বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ এবং ইহা শোকান্ত।

বামারচনা।

অণুর জাতকর্ম্ম।

ছিনু সবে, দূরে দূরে আপনা লইয়ে,
আজ কেন মিলিয়াছি? কার সাড়া পেয়ে?
আজিকে সবারে ডাকি আনিল কে বল?
কার তরে এত হাসি এত কোলাহল? ১

আজ হেথা শুভদিনে বন্ধুগণে মিলি
এসেছি পূজিতে দেবে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
সিদ্ধিদাতা পিতা তুমি সিদ্ধ হৌক তবে
স্বরগের শিশুটীর 'জাত কর্ম্ম' ভবে। ২

আজ হ'তে তুমি ওরে চিহ্ন দিয়ে রেখো,
সংসার সংগ্রাম মাঝে ওরে তুমি দেখো।
স্বরগকুমার আহা জানেনা সংসার,
বুঝে না কেমন ধারা কিবা রীতি তার। ৩

অমর বন্দিত ধামে এ শিশু সুন্দর
ছিল যবে; তুমি তার করেছ আদর,
তোমারি সুখের কোলে করিত বিহার,
বিশ্বরাজ তুমি তার লয়েছিলে ভার। ৪

এবে বল দয়াময় কার হাতে তারে
দিলে সঁপে; নিরাপদে সদা রাখিবারে?
কোন্ দোষে বল বিভু স্বর্গভ্রষ্ট হ'য়ে
সেই শিশু 'অণু' এল মানব আলয়ে? ৫

স্বরগ উদ্যানে বসি শিশু সুকুমার,
আছিল বিকাশি কত সৌন্দর্য্য অপার,
অজানিত সেই ধামে হেন কত ফুল,
রেখেছ সাজায়ে তুমি, শোভার অতুল! ৬

আছে ফুটে কত শত পারিজাত সেথা,
এ কলিকা এল হেথা ল'য়ে কি বারতা?
তুমি তারে পাঠায়েছ কণ্টকের মাঝ,
(তাই) বৃন্তচ্যুত ফুল হেথা ফুটিয়াছে আজ। ৭

দিলে যদি দিব্য রত্ন আমাদের করে,
লইব তোমার দানে পরম আদরে।
তোমারি আশীষোপরি করিয়া নির্ভর
ফুটাতে পারিগো যেন এ কলি সুন্দর। ৮

হেথা তার কিছুই যে জানা শোনা নাই,
এসেছে দীনের মত আমাদের ঠাঁই,
সুরপুরবাসী শিশু, স্বরগ বিভব
বিলায়ে লইল করি আপনার সব। ৯

এই মত শিশু যেন থাকে প্রফুল্লিত,
সংসার কণ্টকাঘাতে না হয় ব্যথিত।
মলিনতা যেন ওরে না পারে ছুঁইতে,
অকলঙ্ক হাসি টুকু না পারে মুছিতে। ১০

পিতার আশীষে 'অণু' থাকে যেন সুখে,
বরষি অমিয় রাশি সবাকার বুকে।
ধন্য হবে পিতামাতা আর পরিজন,
পূর্ণ হবে আনন্দেতে মাসিমার মন। ১১
(অণু) ত্রিদিবদুর্লভ তুমি পারিজাত ফুল
আলো করে ছিলে পূত মন্দাকিনী-কূল।
দেববালা—মনোলোভা সে বিমল বিভা,
(হেথা) এসেছ কি বিকশিতে ; সে নন্দন-শোভা। ১২
সত্য পথে 'অণু' তুমি থেক অনুক্ষণ,
পিতারে দেখায়ে করো সন্দেহ ভঞ্জন,
সুমধুর হাসে, ভাষে, নাশিও বিষাদ,
শুভ দিনে মাসিমার এই আশীর্ব্বাদ। ১৩

শ্রীমতী কমলিনী—

বিদায়।

(রাণী কুসুমকুমারী দেবী মহাশয়ার স্থানান্তর গমনোপলক্ষে প্রীতি-উপহার)।

কত ফুল ফোটে এই সংসার কাননে—
মানবের প্রীতি তরে—দেব-আরাধনে ;
সকলে মানব-যোগ্য, হয় না দেবের ভোগ্য,
সুবাসে করে না কারো আকুল পরাণ—
করে না সবার কাছে আত্মবলিদান।

কত স্নেহ যত্ন করে আপন উদ্যানে—
রোপে চারু গাছগুলি অতি সযতনে ;
একে একে ফোটে যবে, কুসুম কলিকা সবে,
দেয় না সুবাস তারা মধু নিরমল,
আপন গরবে যেন সদাই চঞ্চল।

নিবিড় অরণ্যে কোথা কোন্ এক পাশে—
ফুটে আছে কেতকিনী আপন সুবাসে ;
করেছে জগত স্তব্ধ নিজ গুণে, নাহি শব্দ,
শত দূর থেকে সবে টানে সযতনে,
আকুল সতৃষ্ণ হয়ে ধায় তার পানে।

তেমনি এ কণ্টকিত সংসার কাননে—
রমণী কুসুম ফোটে অতি সংগোপনে ;
কোমল জীবনগুলি, ফুলের কোমল কলি,
ফোটে তারা নিতি নিতি সুগন্ধ সুন্দর,
স্রষ্টার উদ্দেশ্য মহা সাধে নিরন্তর।

ভক্তি, প্রীতি, প্রেম দিয়ে সাজাইয়ে সবে,
পাঠালেন ধাতা এই মরুময় ভবে,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে, যেথানে যা কিছু ধরে,
সকলই দে'ছেন, কিন্তু সকলই অসার ;
কেহই করে না কার্য্য জগতে তাঁহার !

সকলেই স্বার্থপর, নিজ স্বার্থ লয়ে
কাটাতেছে দিন যামী ব্যতিব্যস্ত হয়ে,
নিজের সুখের তরে, ঘুরে মরে নারী নরে
ঢালে না নিঃস্বার্থ প্রেম জগতের পরে,
চাহে না অনাথ পানে কারেকের তরে !

এ'রো মাঝে দেখা যায় রমণী রতন
দেবতার আশীর্ব্বাদে দেবীর মতন।
মানবীতে দেবী যারা, খুঁজে মেলা ভার তা'রা,
থাকে কোথা কোন্ এক নিভৃতে গোপন,
নীরব নিস্তব্ধ ভাবে কাটায় জীবন।

তেমনি তুমি গো সখি ! রমণী-প্রধান,

দেবতার আশীর্ব্বাদে দেবীর সমান।
আছে তোর হৃদে যত, মণি মুক্তা মরকত,
পেয়েছি যে দিন সখি! সন্ধান তাহার—
হয়েছি বিমুগ্ধ আমি কি ক'ব লো আর?

জগতের কোথা এক নিভৃত প্রদেশে—
জন্মেছ তুমি লো সখি দেবের আশীষে,
তাঁর প্রিয় কার্য্য তরে, পাঠায়ে দেছেন তোরে
অসম্পূর্ণ কত কাজ রয়েছে জগতে,
সম্পূর্ণ করিতে হবে তোর জীবনেতে।

জগতের ধনৈশ্বর্য্য গৌরব-বিক্রম—
তোর কাছে নহে সখি কিছুই তো কম।
সে সকল তুচ্ছ তোর, ভগবৎ-প্রেমে ভোর,
তোর ও অমূল্য হৃদি সদা প্রেমময়,
নিভৃত কামিনী ফুল প্রেমই বিভরয়।

নিভৃতে থাকিয়া সখি করিছ সাধন—
আপন জীবন ব্রত করিয়ে যতন;
নানাদেশে প্রেম রাজ্য, করিতে তাঁহার
কার্য্য,
তাই কি প্রবাসে সখি করিছ প্রয়াণ,
করিবে প্রেমের কার্য্য—প্রেম শিক্ষা দান?

তাই বোন্ আমাদের রয়েছে তো কত,
ধর্ম্মহীন কর্ম্মহীন জীবন সতত;
যাও সখি সেই খানে, তাদের বিশুষ্ক প্রাণে.
ঢালো গে-অমৃতধারা প্রেমবারি দিয়া,
তৃপ্ত হোক মরু প্রাণ তোমা পরশিয়া।

চারি দিকে কত কাজ রয়েছে পড়িয়া,
সম্পূর্ণ করগে সব জীবন ভরিয়া—
ভগবান সাথী করে, চলে যেও পথ ধরে,
জীবনের সদাব্রত ক'রো উদযাপন,
মস্তকে রাখিয়া সদা বিভুর চরণ।

এ প্রার্থনা করি আজি তাঁহার চরণে—
চরণে রাখেন (তোমা) যেন জীবনে মরণে,
বিদায়ের শেষদিনে, এনেছি অতি যতনে
সামান্য এ ক্ষুদ্র অতি কবিতার হার,
নে'বে কি লো সখি এই প্রীতি-উপহার?
ল'ও যদি হাসি মুখে,
চলে যাব মহা সুখে,
বিদায়ের দিনে সখি এই উপহার।

তোমার স্নেহের ভগিনী—
মেদিনীপুর।

বাল্যসখী সরলা।

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বাল্য সহচরি,
স্নেহের কুসুম হার সরলা আ মরি!
ভুলি নাই প্রাণসখি ভুলিতে কি পারি?
শয়নে স্বপনে সদা তোমারে নেহারি। ১
যত স্নেহ করিয়াছ সব আছে মনে,
শৈশব কালের মিল ভুলিব কেমনে?
বাল্য-স্নেহ ডোরে বদ্ধ আছি গো দুজনে,
ভুলিতে নারিব সখি তোরে এ জীবনে। ২
রেখেছি তোমারি স্নেহ হৃদে সদা ধরি,
তব প্রীতি-ফুল-মালা গলে আছি পরি,
ও কমল মুখ চারু অঙ্কিত এ হৃদে,
পারে কি ছাড়িতে হৃদি সরলা সুহৃদে? ৩

শিশুকালে কত গল্প করেছি দুজনে,
এখনও সে কথা জাগে সদা মোর মনে।
সে সুখের দিন ফিরে আসিবে কি আর,
ফিরে কি গো দেখা সখি! পাইব তোমার? ৪
প্রাণসখী সরলার কি সরল মন,
স্রোতস্বিনী ভাগীরথী বহিছে যেমন!
অমন সরল মন আমি যদি পাই,
ধরা ছাড়ি স্বর্গধামে যাইতে না চাই। ৫
আহা সতী পতিব্রতা সরলা কুসুম,
এ ধরায় নও তুমি স্বর্গের প্রসূন,
এ সরল ফুলে সাধ করে পরি গলে,
আহা মোর প্রিয় ভগ্নি সরলা নির্ম্মলে। ৬
প্রাণ-ভগ্নি! আছ কত দূরদূরান্তরে,
তব বাল্যসখী-প্রাণ কাঁদিছে কাতরে।
দুজনে সুদিনে কি গো দেখা হবে ফিরে,
পুনশ্চ সে দিন বিধি ফিরাইবে কিরে? ৭
হইবেক দেখা তাই আশা আছে মনে,
আশা নাহি ত্যজে কভু মনুষ্য জীবনে,
তোমারি মিলন আশা আছে মোর মনে,
রেখেছি আশায় বুদি বাঁধিয়া যতনে। ৮
এখন বিভুর পায় এই ভিক্ষা চাই,
যে, যেখানে আছ সবে সুখে থাক ভাই,
ইহার অধিক আর কি বলিতে পারি,
জানেন হৃদয়-কথা হৃদয়-বিহারী। ৯

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

চুরি।

আমি অভাগা বলিয়ে
　　মা কি মোরে ভুলে রবে?
অধম চঞ্চল বলে
　　কোলে তুলে নাহি লবে?
অপদার্থ বলে কি গো
　　মা তোমার স্নেহধারা
বর্ষিবে না শুষ্ক হৃদে
　　রহিব কি মরুপারা?
সবিত্ত দিয়াছ মোরে
　　কিছু অপ্রতুল নাহি।
কিন্তু হায়! দীনা আমি
　　ভুঞ্জিতে অক্ষম তাহি।
দৃঢ়তা কিছুতে নাহি
　　উচ্ছৃঙ্খল এ জীবন,
তাই উপেক্ষিয়া আছি
　　মার দত্ত সব ধন।
হৃদয়েতে যত কিছু
　　বিভবের প্রয়োজন,
দিয়াছে সকলি সে যে,
　　তবু আমি অভাজন।
সবারে যতনে আমি
　　রক্ষিতে পারিনে বলে,
উপেক্ষা করিয়া সবে
　　একে একে গেছে চলে।
দয়া প্রীতি প্রেম ভক্তি
　　পবিত্র বিভব যত,
সত্য ক্ষেম ধৈর্য্য নীতি
　　অমূল্য ভূষণ কত।

আদরে যতনে মা তা
সাজায়ে দিছিল মোরে,
সব হয়ে গেছে চুরি
আমার দুর্ভাগ্য-ফেরে।
কখন করিল চুরি
নাহি জানি অচেতন,
দুর্জ্জয় অলস ঘুমে
ছিনু মোহে নিমগন।
অবসর পেয়ে চোর
পশিয়া প্রাণের পুর,
নিয়াছে সর্ব্বস্ব হরি—
মম হৃদি-কোহিনুর।

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন।

গুরু-দক্ষিণা।

কৈশোরের গুরুদেব তুমি গো আমার,
ভকতি কুসুম দলে,
প্রেম জাহ্নবীর জলে,
প্রাণে প্রাণে নিতি পূজি চরণ তোমার। ১
তব চিত্রপট যদি নেহারি নয়নে,—
বুকে কৃতজ্ঞতা স্রোত,
বহে মোর ওত প্রোত,
অমনি নমি গো দেব লুটায়ে চরণে। ২
কল্পনা সুন্দরী মোরে তোমারি দয়ায়,—
অসীম সোহাগ ভরে,
ধরিয়া যুগল করে,
স্বরগ আসন মাঝে যতনে বসায়। ৩
তোমারি দয়ায় দেব তোমারি দয়ায়,—
কবিতা সুন্দরী আসি,
ঢালেগো অমিয়ারাশি,
অমনি কৃতজ্ঞ রসে চিত উথলায়। ৪
বুঝেছি আমি গো দেব! তোমারি কারণ—
নবীন (১) নবীন কবি,
বঙ্কিম (২) স্বর্গের ছবি,
রবিতে (৩) নাহিক ছায়া সবি অতুলন। ৫
ভারত মাতার তুমি উজল রতন!
দয়া ক্ষমা স্নেহ প্রীতি
ও হৃদয়ে রাজে নিতি,
আমি দেখি ও হৃদয়ে অমর ভুবন। ৬
দলাদলি সম্প্রদায়ী তোমারি দয়ায়,
শিখিয়াছি বড় হেয়,
জগতের অবজ্ঞেয়,
সেই গো দেবতা সত্য প্রেম যে ছড়ায়। ৭
বামাবোধিনীতে করে বামা-বোধোদয়।
আমি তোমা দেখি যেন,
স্বর্গীয় দেবতা হেন,
সাধে কি কৃতজ্ঞ রসে উথলে হৃদয়! ৮
শতবার পড়ি তব পত্র যবে পাই,
দেব গো তোমার পত্রে,
সুধা ঝরে ছত্রে ছত্রে,
সাধে কি বিভল হ'য়ে চরণে লুটাই! ৯
স্মরিতে তোমার গুণ উথলে হৃদয়,
যত দিন রবে বিশ্ব,
তুমি গুরু আমি শিষ্য,
এ সম্বন্ধ যেন নাহি বিদূরিত হয়। ১০

কি দিয়া তোমারে গুরু ! করিব পূজন,
দুর্ব্বলা অবলা নারী,
কি তোমারে দিতে পারি ?
ধর কৃতজ্ঞতা-গুরু-দক্ষিণা এখন। ১১

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

মরণ।

জীবনের উষারাণী !
কোথায় মরণ এস !
বড় ভাল বাসি তোরে
এ দুখ তামস নাশ।১।

পারি না বহিতে আর
এ অলস দেহ ভার,
নামাতে তোমারি পায়
ডাকি তাই বারেবার। ২।

সুধাময়ী হাসি মুখে
মরণ ত্রিদিব রাণী,
জুড়াও দগধ হিয়া
বল দুটি সুধা-বাণী।৩।

কি কাজ জীবনে আর
বৃথা ভার বহি সদা,
এ নায় তুলিয়ে লও
হতে, তব এ বসুধা।৪।

নাশিতে সংসার-জ্বালা
কেহ নাহি অবনীতে,
তোমার কৃপায় মৃত্যু !
হাসে জীব ক্ষুদ্র চিত্তে।৫।

কল্পনায় স্বপ্নাবেশে
জ্যোৎস্না নিঝুম নিশি,
বসি নীলাকাশ তলে
হেরি তব রূপরাশি। ৬।

মরি ! কি মধুর কান্তি
ঝলকে ঝলকে ক্ষরে,
অমিয় সুধার বিন্দু
প্রাণ বিমোহিত করে।৭।

তোমার পরশে নর
নূতন জীবন পায়,
মরতের অশ্রুকণা
সে নয়নে নাহি বয়।৮।

তব কৃপা কটাক্ষেতে
বহিবে বসন্তানিল,
ভগন পরাণে সদা
ফুটিবে চামেলি বেল।৯।

জীবনের শান্তি-দাত্রী
সুখৈশ্বর্য্য অধীশ্বরী,
শান্তিময় কোলে তব
তুলে লও ত্বরা করি।১০।

শত শত কালানলে
জ্বলিতেছে এ হৃদয়,
অশান্তি আবাসভূমি,
রাখিয়া কি ফল তায় ?১১।

তাপিত পরাণ মম
জুড়াইব স্নেহ-ছায়ে,
এস তরী মরণের
দিব দেহ তব নায়ে।১২।

হাসি মুখে যাব দোঁহে
সেই বৈতরণী তীরে,
ধরার এ সুখ দুখ
পড়ে রবে পরপারে।১৩।

সহে না সহে না দেবী !
এই জলন্ত পরাণী—
ঢালিব তোমারি পায়
এস গো মরণ রাণী !১৪। শ্রীহে।

১৩০৫ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও জীবনচরিত।

৫। উপন্যাস।

৬। বিজ্ঞান।

৭। গৃহচিকিৎসা ও গৃহকার্য্য।

৮। পদ্য ও সঙ্গীত।